স্বকৃত নোমান

সমুদ্রে সন্ত্রাস

উপন্যাস

ফেব্রুয়ারির উনত্রিশ তারিখ ভোরে এমভি সাউথ বেঙ্গল-৩ জাহাজটি নোঙর তুলল। যাত্রার শুরুতেই পর পর দুটি হত্যাকাণ্ড যাত্রীদের স্তব্ধ করে দিল। তখন সকাল প্রায় সাড়ে সাতটা। সূর্যে দুনিয়া উজালা করা হীরকদ্যুতি। ছাদে যাত্রীদের ভিড়। টয়লেটের সামনে লাইন পড়ে গেছে। লাইনে অপেক্ষমাণরা পায়খানা-পেশাবের চাপে কঁকাচ্ছে আর ভেতরে যারা তাদের যাচ্ছেতাই গালাগাল করছে, 'বাপরে! পেট না গোলা! খানকি-মাগির বেটারা, ভরা গোলা খালি করতেও তো এত সময় লাগে না।' গালিটা যে দিচ্ছে তার মনে হচ্ছে ভেতরে ঢুকে এক মিনিটেই সে কাজটা সেরে ঝটপট আবার বেরিয়ে আসতে পারবে, অথচ ভেতরে ঢুকলে তারও খবর থাকে না, এক মিনিটের জায়গায় নিশ্চিন্তে পাঁচ-সাত মিনিট পার করে দেয়।

জাহাজে টয়লেট মোটে দুটি। একটি নিচতলায় স্টাফ কেবিনের পেছনে, আরেকটি আন্নির নিচে স্টোর রুমের কাছে। কেবিনের দোতলায় অবশ্য আরো একটা আছে। কিন্তু দোতলায় তো ওঠা বারণ। সিঁড়ির গোড়ায় লাঠি হাতে দুই প্রহরী সতর্ক পাহারায়। কেউ উপরে ওঠার চেষ্টা করলে বাধা দিচ্ছে। চাপ সইতে না পেরে কেউ কেউ কাপড় নষ্ট করে ফেলেছে। কী আর করবে তা ছাড়া? এটা এমন এক চাপ, সামনে কোরমা-পোলাও ফেলে রাখলেও ছুঁয়ে দেখবে না। বুক উদোম করে জগতের সেরা সুন্দরীটি সামনে দাঁড়ালেও ফিরে তাকাবে না। চাপ সামাল না দেওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর সব কিছুই বিস্বাদ। চাপের তীব্রতা সইতে না পেরে এক কিশোর ঝটপট লুঙ্গি তুলে দেয়ানি হলের ওপর হিসু করতে বসে গেল। তার দেখাদেখি বসে গেল আরো কয়েকজন। মুহূর্তে দু-পাশের দুই হলে শুরু হয়ে গেল পেশাবের প্রতিযোগিতা।

সানগ্লাসওলা রনি আন্নিতে উঠে দু-হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিল। যেন সে পাখি। ডানা মেলে মুক্ত আকাশে উড়ছে। কণ্ঠে হিন্দি গানের গুনগুনানি, 'হাওয়া মে উড়তা যায়ে, মেরে লাল দোপাট্টা মলমল...।' গুনগুন করতে করতে প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইলটি বের করে ভোরের শান্ত সমুদ্রের কয়েকটা ছবি তুলল। ছবি তোলার শেষ নেই তার। গত দুদিনে কত ছবি তুলেছে হিসাব নেই। যে দৃশ্য ভালো লেগেছে মোবাইলটি তাক করে ক্যামেরার বাটন টিপেছে। শখের সানগ্লাসটি এখন চোখের বদলে মাথায়

তোলা। জিন্সের প্যান্ট, টি-শার্ট আর ক্যাট্‌স পরায় দেখতে পাড়ার পুচকে মস্তানের মতো লাগলেও মুখের দিকে তাকালে শান্তশিষ্ট সুবোধ বলেই মনে হয়। চোখ দুটি কোটরে ঢোকা, ভ্রু দুটি ঘন, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথার চুলে আর্মিকাট, মুখের মতো নাকটাও লম্বা। বয়স বিশ-একুশের বেশি হবে না। কারো সঙ্গে তেমন মেশে না, কথাও বলে কম, সারাক্ষণ মোবাইলটি নিয়েই ব্যস্ত। হয় ছবি তুলছে, নয় তোলা ছবিগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে। অন্যদের চোখেমুখে যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তার লেশমাত্রও তার চেহারায় নেই। যেন সে প্রমোদতরীতে ভ্রমণে বেরিয়েছে, ইচ্ছেমতো ফুর্তি করে ভ্রমণ শেষে আবার বাড়ি ফিরে যাবে।

চার্জ ফুরিয়ে যাওয়ায় রনির মোবাইলটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল তার। জাহাজে তো চার্জের ব্যবস্থা নেই, কবে আবার খুলতে পারবে ঠিক নেই। গন্তব্যে পৌঁছতে দশ দিনও লাগতে পারে, পনেরো দিনও লাগতে পারে। কপাল খারাপ হলে বেশিও লাগতে পারে। এত দিন মোবাইল বন্ধ থাকবে ভাবতেই মনটা বিষাদে ছেয়ে যাচ্ছে। মোবাইল ছাড়া তার একদিনও চলে না। ঘুমানোর সময়ও সিথানে থাকা চাই। কানে হেডফোন লাগিয়ে গান না শুনলে তার ঘুম আসে না।

মোবাইলটি পকেটে ঢুকিয়ে বিষণ্ন মনে আন্নি থেকে নেমে হেজের গলিতে দাঁড়াল রনি। যাত্রীরা খাবার পানির জন্য হৈচৈ করছে। রাতে জনপ্রতি মাত্র এক মগ পানি দিয়েছে, আরেক মগের জন্য চেঁচামেচি করেও লাভ হয়নি। সবাই এখন তৃষ্ণার্ত। তা ছাড়া ঘুম থেকে উঠে মুখটা তো ধোয়া লাগে। মুখ থেকে পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। শোরগোল শুনে বাবুর্চি তার প্রকাণ্ড বপুটা নাচাতে নাচাতে স্টাফ কেবিনের দরজায় এসে দাঁড়াল। চোখে এখনো ঘুমের রেশ। লম্বা একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে চেঁচিয়ে বলল, 'তোমাগের চোখ নাই? টয়লেটে পানি দেখতে পাচ্ছ না?'

যেন সে মৌচাকে ঢিল মারল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই হৈহৈ করে উঠল, 'ইয়ার্কি নাকি! আমাদের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না? এই নোনাপানি মুখে নেওয়া যায়? এমন জহরজালিম নোনা, মুখে নিলে পেট উল্টে বমি আসে। তাড়াতাড়ি ভালো পানি দাও। পানির নাম জীবন। ফাজলামি?'

বাবুর্চি এবার গলা নামায়। ঠান্ডা মাথায় বোঝাতে চেষ্টা করে যে, জাহাজ গন্তব্যে পৌঁছতে অন্তত দশ দিন লাগবে, হাতমুখ ধুয়ে খাওয়ার পানি খরচ করে ফেললে পরে তো তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরতে হবে।

কাশু বুড়ো মাথা নাড়িয়ে তার কথার সমর্থন দেয়, 'বদ্দায় ঠিক কইয়্যে। বেহুদা কামত পানি খরচ গরিবো কেইত্তো?'

রনি চোখ পাকিয়ে বুড়োর দিকে তাকায়। বিব্রত কাশু দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়। মিনমিনে গলায় বকে। কী বকে সে ছাড়া আর কারো বোঝার সাধ্য নেই। রনি তার চোখের ফাল, দেখলেই চোখে জ্বালা ধরে। রনি হাঁক দিয়ে বাবুর্চির উদ্দেশে বলে, 'এ্যাতো কতা বুঝি না, পানি খাইতে চাই পানি দ্যান। দিতে না পাল্লে জাহাজ ঘুরাইন। বিদেশের গুষ্টি মারি, যাইতাম না বিদেশে।'

হট্টগোল শুনে মাস্টারের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমিয়েছে শেষ রাতে। রাত প্রায় দেড়টা পর্যন্ত রোহিঙ্গা যুবতী লতিফার সঙ্গে কাটিয়েছে। লতিফার শরীরটা পুরুষালি, বগলে ও জংঘায় উৎকট ঘামের গন্ধ, কিন্তু ঘাড়ে এক অপার্থিব সুঘ্রাণ। রাত দশটায় মাস্টার তাকে রুমে তোলে। পোষ মানাতেই লেগে যায় দুই ঘণ্টা। গায়ের রংজ্বলা কালো বোরখাটা কিছুতেই খুলবে না লতিফা। মাস্টার প্রথমে তাকে লোভ দেখায়, যত দিন জাহাজে থাকো কোনো সমস্যাই হবে না তোমার। পথ খরচের টাকা-পয়সাও কিছু দেওয়া লাগবে না, ঠিকঠাকমতো তোমাকে মালয়েশিয়া পৌঁছে দেব। বিনিময়ে রোজ রাতে শুধু একবার আমার রুমে এসে আমাকে খুশি করে যাবে। লতিফা রাজি হয় না। মাস্টার তাকে বোঝায়, ভয় কীসের? চামড়ার ওপর চামড়া যাবে, ক্ষতি তো কিছু নাই। লতিফা তবু রাজি হয় না। মাস্টার জোর করে তাকে বুকে চেপে ধরে। লতিফা এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে মাস্টারের গালে থুতু ছিটিয়ে দেয়। মাস্টার তাতে আরো মজা পায়। লুঙ্গিটা তুলে থুতুর দলাটা নিজের লিঙ্গে লাগায়। হেঁচকা টানে লতিফাকে বিছানায় ফেলে দেয়। লতিফা আর উঠতে পারেনি বা ওঠার চেষ্টা করেনি। হয়ত অনিবার্য পরিণতিকে মেনে নেয়।

উদোম গায়ে ঢুলুঢুল চোখে কেবিনের বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়াল মাস্টার। হাবভাব দেখে যাত্রীদের মনে হলো যেন সে ডাকসাইটে কোনো জমিদার। জমিদারই বৈকি। যার হুকুম ছাড়া জাহাজের ক্ষুদ্র বস্তুটিও নড়ে না, যার ভয়ে সুকানি গ্রিজার বা প্রহরীরা হাঁচি-কাশি দিতেও তিনবার ভাবে, সে তো জমিদারই। কাঁচা-পাকা দাড়ি জানান দিচ্ছে বয়স পঞ্চাশের কম নয়। চেহারায় জলজ অভিজ্ঞতার ছাপ। সারাক্ষণ কেবল পান চিবোয়। এক খিলি শেষ হওয়ার আগেই আরেক খিলি মুখে ঢুকিয়ে দেয়। কোনো কোনো রাতে মুখে পান নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। দেখে মনে হয় না মেজাজি, কিন্তু যখন কথা বলে মেজাজের মাত্রা তখন টের পাওয়া যায়। গালি ছাড়া যেন কথাই বলতে পারে না। কথায় কথায় শুধু গালি। গালি দিয়ে কথা শুরু করে, গালি দিয়ে শেষ করে। জাহাজিরা তাকে হেদুভাই বলে ডাকে। হয়ত তার নাম হেদায়েত, হেদায়েতুল্লা বা হেদায়েত হোসেন। ছাদে এত আদমের ভিড় দেখে হেদুভাইর মেজাজ চড়ে গেল। চিৎকার করে গালাগাল শুরু করল, 'এই বাদির ছাওয়ালেরা, ছাদে কী তোগের? কোস্টগার্ডেরটিন ধরা খালি তোগের বাপ আইসে ছাড়াবিনি?'

দাঁতাল শুয়রের মতো তার চিৎকারে খানিকের জন্য যাত্রীদের হট্টরোল থামে। এই নীরবতার সুযোগ নিল তালেব। গলা চড়িয়ে বলল, 'নিচে নামব কেন? এখন কি রাত?'

তার কথায় রনিও সুর মেলায়, 'নিচে কুনো মানুষ থাকতারে? কয়বরখানা একটা।' যাত্রীদের উদ্দেশে বলল, 'আপনারা কেউ নিচে যাইবাইন্যা। দেহি কেডা কী করতারে।'

ক্রুদ্ধ চোখে রনির দিকে তাকাল মাস্টার। চোখে ঘুমের ঢুলুঢুল ভাবটা উবে গেল। চোখ দুটো যেন হিংস্র হায়েনার। তুঙ্গে চড়ার জন্য তৈরি হয়ে থাকা মেজাজের লাগামটা টেনে ধরে নরম গলায় সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করল, রাত-দিন বলে কথা নয়, পায়খানা-পেশাবের দরকার ছাড়া আপাতত ওপরে ওঠাই যাবে না। এদিকটায় মিয়ানমারের কোস্টগাড টহল দল একবার তাদের হাতে ধরা খেলে কারোর রক্ষা নেই, সোজা জেলখানায়।

কাশু বুড়ো যথারীতি তার কথায় তাল মেলায়, 'ঠিক ঠিক। হারামির পোয়া-অক্কল একবার ধইরলে আর ন ছাড়ে। এক্কোওয়ারে কচ্ছপের কামড়। আসমান ডাকিবার আগে ন ছাড়ে।'

রনি যথারীতি আবার চোখ পাকায়। কাশুর নাকের ডগায় আঙুল নাচাতে নাচাতে বলে, 'আসল হারামি তো মিয়া আপনে। সব কথায় শুধু হে হে। ফাউল কুনান্তে!'

কাশুও কম যায় না, সেও ঠোঁট বাঁকিয়ে আঙুল নাড়িয়ে বলে, 'বেশি ন চেতিও বাজি। বেশি চেতিলে পরে পস্তন পরিবো, বুইজ্জ নে? বলে সে মুখ ঘুরায়। হাতের তালু কপালে ঠেকিয়ে দূরে তাকায়। মৌসুমি বায়ু উত্তর থেকে দক্ষিণে ঘুরছে, ধীরে ধীরে রোদের তেজ বাড়ছে। তার চিতেপড়া পাঞ্জাবির বগলটা ভিজে উঠেছে ঘামে। পকেট থেকে বান্ডিলটা বের করে একটা বিড়িতে আগুন ধরায়। দু টান মেরে নাকেমুখে ধোঁয়া ছাড়ে। মাস্টারের কথায় সে সমর্থন দিয়েছে, অথচ নিজে নিচে নামার কোনো তাড়া বোধ করে না।

বিড়ির গন্ধে কমলের মাথাটা ভোঁ-ভোঁ করছে। একটা টান দিতে পারলে মাথার জটটা ছাড়ত। ভিড় ঠেলে কাশুর সামনে এসে হাতটা বাড়িয়ে বলল, 'দেন চাচা, একটা টান দিই।' কাশু হাতটা পেছনে সরিয়ে ভ্রু কুঁচকে তার মুখের দিকে তাকাল। ভ্রুর কুঁচকানি অর্থ, এ্যাঁহ! বিড়ি কি দরিয়ার পানি যে চাইলেই দিয়ে দেব? গুনে গুনে দশটা বান্ডিল নিয়ে জাহাজে উঠেছি। এ কদিনে আবার আট বান্ডিল খতম। এত শখ হলে বিড়ি নিয়ে উঠলে না কেন?

ভ্রুটা স্বাভাবিক হওয়ার আগেই আচমকা হৈহৈ করে উঠল কাশু। তার বিড়িটা পেছন থেকে দীপঙ্কর কেড়ে নিয়েছে। পেছনে তাকিয়ে দেখে দীপঙ্কর সুখটান মারছে। যক্ষের ধন ছিনতাই হয়ে যাওয়ায় গালাগাল শুরু করল কাশু। দীপঙ্করের কাণ্ড দেখে এত দুঃখের মধ্যেও কমলের হাসি পেল। কষে দুটো টান দিয়ে দীপঙ্কর বিড়িটা কমলকে দিল। বান্ডিল থেকে আরেকটা বিড়ি বের করতে করতে কাশু বলে, 'তোরা আঁরে পাগল পাইয়দ্দেনে? দেখবি, মুখত পোগায় ধইরবো। আঁর বিড়ি কাড়ি লইয়স, দেইস, তোর মুখ পচিয়রে গলি পরিবো।'

মাস্টারের বুঝ মেনে কিছু যাত্রী নিচে নেমে গেলেও অনেকে পানির জন্য আবারো হৈচৈ শুরু করে দিল। স্টোররুমের সামনে মহিলার দলটিও চ্যাঁ চ্যাঁ করছে। মেজাজের লাগামটা আর টেনে ধরে রাখতে পারল না মাস্টার। নিজের রুমে ঢুকল। খানিক পর বেরিয়ে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল। মাথায় ক্যাপ পরা, ওপরের পাটির একটা দাঁত আর বাঁ হাতের

কজিহীন যুগপৎ বিশ্রী ও হাস্যকর লোকটা, যার নাম মাসুক, দাঁড়াল তার পেছনে। মাসুককে দেখে মঈনের চোখ দুটি এক লাফে কপালে উঠে গেল। এই যমের বেটা এলো কোত্থেকে! জাহাজে ওঠার পর তো একবারও তাকে দেখা যায়নি! মঈন ভেবেছিল আবার বুঝি শাহপরী ফিরে গেছে মাসুক। ভেবে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিল। লোকটার ভয় এখনো তার মনে গেঁথে আছে। মানুষ কতটা পাষাণ হতে পারে ট্রলারে সেদিন তার আচরণে বুঝেছে। জেটিঘাট থেকে তাকে জোর করে তুলে ট্রলারটি নোঙর তোলার পর মাঝিদের হুমকি-ধমকি দিচ্ছিল তালেব। কাঠের একটা চেলি হাতে কজিকাটা মাসুক উড়ে এসে তালেবকে শাঁসাতে শুরু করে,

'কারে ধমক দদ্দে? আঁরে চিনস নে তুই? পোনত বাঁশ ঢুকাইয়ারে দইজ্জার মাঝে থিয়া গরাই রাইখ্খুম মাগির পোয়া কত্তুন।'

অমাসুকের কুঁদন দেখে ভয়ে দমে যায় তালেব। যাবারই কথা। অজানা-অচেনা জায়গা, মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিলেও কিছু করার থাকবে না। স্তব্ধচোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে তালেব। ফাঁদে পড়া বকের মতো মঈন তড়পায়। মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পায় না। একবার ভাবে জলে ঝাঁপ দেবে, কিন্তু সাহসে কুলায় না। নদী কত গভীর ঠিক নেই। স্রোতও ভয়ংকর। উপায় খুঁজে না পেয়ে সে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে। প্রমত্তা নাফের বিপুল জলরাশি আর সন্ধ্যার বিষণ্ন অন্ধকার তার কান্না আরো উসকে দেয়। কোনোভাবেই থামাতে পারে না। যেন আজন্মের জমা কান্নার উদগীরণ ঘটেছে। সেন্টমার্টিন পৌঁছা পর্যন্ত থেমে থেমে কান্না চালিয়ে যায়।

ওসমানকে তুলতে ট্রলারটি সৈকতে ভিড়লে এক টুকরো আশা তার চোখে ঝলকে ওঠে। কে যেন তখন তার কানে কানে বলে, এটা মোক্ষম সুযোগ মঈন, পালাও পালাও। সুযোগ আর নাও পেতে পারো। মঈন সাড়া দেয়, নিশ্চয়ই পালাব। এই সুযোগ কিছুতেই আমি হাতছাড়া করব না। পরিস্থিতি বুঝতে ঘাড় ঘুরিয়ে সে মাঝিদের দিকে তাকায়। মাঝিরা ইঞ্জিনের কাছে। নিঃশব্দে সে উঠে দাঁড়ায়। যেই না লাফ দিতে যাবে, অমনি পেছন থেকে কজিকাটা মাসুক তার কলারটা চেপে ধরে বলে, 'কডে যদ্দে হারমজাদা?' বলেই হেঁচকা টানে পাটাতনে ফেলে চেলিটা দিয়ে মারতে শুরু করে। মানুষকে নয়, যেন গরু-ঘোড়াকে চবকাচ্ছে। মঈন কাঁদে না, একবার চিৎকারও করে না। মারটা যেন তার প্রাপ্য। সুদে-আসলে বুঝে নিচ্ছে।

কিন্তু শরীরটা তো রক্ত-মাংসের, মার আর কতক্ষণ সওয়া যায়। এমন অবস্থায় পড়লে মানুষ বিদ্রোহী না হয়ে পারে না। মঈনও হয়। চেলিটা আচমকা দু'হাতে ধরে ফেলে। ব্যস, শুরু হয়ে যায় সাপ-নেউলের লড়াই। শক্তিতে কেউ কারো চেয়ে কম নয়। এমন ধস্তাধস্তির মধ্যে তালেব কি আর বসে থাকতে পারে? উঠে দুজনকে থামাতে যাবে অমনি আরেক মাঝি উড়ে এসে মঈনের পাছায় মারে প্রচণ্ড একটা লাথি। পাটাতনে উপুড় হয়ে পড়ে যায় মঈন। নাক আর ঠোঁট ফেটে রক্ত দেখা দেয়। চোখের সামনে এমন মারদাঙ্গা দেখে কর্তব্য ঠিক করতে পারে না জুলফিকার। মাঝিদের উদ্দেশে বলে, 'তুমরা কি মানুষ? ইংকে করে কেউ মারে?'

মাসুক এবার চড়াও হয় জুলফিকারের ওপর। চেলিটা তার মাথার ওপর উঁচিয়ে ধরে শাঁসায়, মেরে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়। ভয় জুলফিকার পায় বটে। তালেবের মতো সেও দমে যায়। যাবে না? মেরে ফেললে কে আসবে বাঁচাতে! সে আর মুখ খোলার সাহস পায় না। সারা পথ মাঝিদের সঙ্গে আর একটা কথাও বলেনি। মঈন আর তালেবও না। মঈনের ফাটা ঠোঁটে এখনো রক্ত লেগে আছে, নাকের ডগাটা এখানো লাল। মাসুককে দেখে তার ভয় হয়, একই সঙ্গে মাথায় রক্তও চড়ে যায়। মাসুকের মাথার তুলি বরাবর একটা বাড়ি মেরে খতম করে দিতে ইচ্ছে করে। বিড়বিড় করে বলে, 'শালার বেটাকে ধাক্কা মেরে যদি নিচে ফেলে দিতে পারতাম।' তালেব তাকে হুঁশিয়ার করে, 'পাগলামি করিস না, সাবধান! ওরা জানোয়ার একেকটা। দেখতেছিস না হাতে কী।'

মঈনের চোখ ততক্ষণে জায়গায় ফিরেছিল, মাসুকের হাতে লম্বা লাঠি আর মাস্টারের হাতে চকচকে রিভলভার দেখে টুপ করে আবার কপালে উঠে গেল। সিঁড়ি বেয়ে দুজনকে নিচে নামতে দেখে ভয়ে নুনপড়া জোঁকের মতো কুঁকড়ে যেতে লাগল সে। নিজের অজান্তে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে ভিড়ের আড়ালে মুখ লুকায় তালেব। মাস্টারের হাতে অস্ত্র দেখে শোরগোলে মত্ত যাত্রীরা চুপসে যায়, বিস্ময়ে অস্ত্রটির দিকে তাকিয়ে থাকে, সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দেয়। রিভলভার হাতে দারোগার মতো হাঁটতে হাঁটতে রনির মুখোমুখি দাঁড়ায় মাস্টার। যাত্রীদের চোখ রনির দিকে ফেরে। রনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার গালে প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় মারে মাস্টার। সঙ্গে সঙ্গে কজিকাটা মাসুক লম্বা লাঠিটা দিয়ে শুরু করে প্রহার। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে যাত্রীদের কেউ হুড়মুড়িয়ে নিচে নামতে থাকে, কেউ নামতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়, কেউ শেষ দৃশ্যটি দেখার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। স্টোররুমের গলিতে দাঁড়ানো মহিলাদের মুখে ভয়ে কথা ফুটছে না। কাশু বুড়ো বলে, 'ঠিক মতন আছে। আঁই ন কই আগে? ওস্তাদের মুখর উয়র কথা কইয়্যুস ব্যাডা। এখন বুঝ ঠ্যালা!'

রনি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে কতক্ষণ মার সইল। প্রতিবাদহীন। সইতে না পেরে একলাফে হেজের ছাদে উঠে পড়ল। শিকারি বাঘের মতো মাসুক উঠল তার পিছে। আবার শুরু করল মার। রনি দু'হাতে ঠেকানোর চেষ্টা করেও পারে না। হাতের আঙুলগুলোতে আর জোর পায় না। মাসুকের লাঠির আঘাত সমানে পড়তেই থাকে। লাঠিটার ওঠাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরটাও কুঁকড়ে যেতে থাকে। সানগ্লাসটি মাথা থেকে ছিটকে গলিতে পড়ে যায়। মাস্টার সেটিকে পায়ে গুঁড়িয়ে দেয়। মাসুক থামে না। শরীরের সব শক্তি ডান হাতে জমা করে সে লাঠি চালায়। ঠেকানোর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় রনি শুয়ে পড়ে। ভাবে, এবার বুঝি মার বন্ধ হবে। কিন্তু না, মাস্টার তাকে লাথি মারে আর মাসুক সমানে লাঠি চালায়। রনি গড়াগড়ি খায় আর আর্তনাদ করে।

মারের চোটে বেদিশ রনি যখন বুঝল ক্ষমা না চাইলে রক্ষা নেই, তখন সে মাস্টারের পা দুটি জড়িয়ে ধরল। যেন অবাধ্য সন্তান বাবার কাছে কৃত অপরাধের ক্ষমা চাইছে। ঠিক তখন ডেগার হাতে স্টাফ কেবিন থেকে ছুটে এলো এক প্রহরী। ডেগারের উল্টো পিঠ দিয়ে রনির হাতে প্রচণ্ড একটা আঘাত করে বলল,'ঠ্যাং ছাড় বাইঞ্চোত। ট্যোন সাহস তুই পাইয়সদে কডে?' রনি পা ছেড়ে দিল। তার বুকে আর পিঠে সমানে লাথি মারে মাস্টার। ফুটবলের মতো গড়াগড়ি খেয়ে রনি আবার মাস্টারের পা দুটি জড়িয়ে ধরে। মাথাটা তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, স্ভাই ভাই...ভুল হইয়্যা গ্যাছে ভাই, মাফ কইর‍্যা দ্যান ভাই। যা কইবেন ঠিক মতোন মাইন্যা চলবাম। মাফ কইর‍্যা দ্যান ভাই...আমি গরিব মানুষ ভাই...।'

মাস্টার কৈ ঝটকায় পা ছাড়িয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে জোরসে কৈটা লাথি মেরে বলে, স্মাপ চুদাইস খানকির বাচ্চা! ভালো কতা ভালো নাগে না তোগের? শালা ফহিরির বাচ্চা, জাহাজে উইঠে বাবুগিরি মারাইস!'

মাস্টারের কথা শেষ হওয়ার আগে ডেগারটা যতটা পারল উঁচিয়ে রনির মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল প্রহরী। ভিড়ের মধ্যে যারা দৃশ্যটা দেখল মুহূর্তের জন্য তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল, অদৃশ্য কোনো শক্তি এসে তাদের যেন মুখে তালা দিয়ে গেল। বিস্ফোরিত চোখে তারা দেখল, মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে, মুখটা হাঁ করে, দুবার নিজের রক্তে গড়াগড়ি খেয়ে, একবার উঠে বসার চেষ্টা করে, ঘোলা চোখে একবার মাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রনি। পা দুটি একবার ভাঁজ করে আবার সোজা করে নিথর হয়ে গেল। সূর্য কিরণ ঝিলিক দিতে লাগল তার রক্তধারায়।

গালাগাল করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে কেবিনে উঠে গেল মাস্টার। আকাশে ওড়ে এক ঝাঁক সমুদ্রচিল। জাহাজের চারদিকে একঝাঁক মাছ লাফাতে শুরু করে। যাত্রীরা নির্বাক। তারা চিলের ঝাঁক দেখতে পায় না, মাথার ওপর বিস্তীর্ণ আকাশ দেখতে পায় না, তেজোদীপ্ত সূর্যটাও দেখতে পায় না, চারপাশের বিপুল জলরাশি ও মাছেদের লাফালাফিও দেখতে পায় না। বিশ্বচরাচরের দৃশ্যমান সব বস্তু ও অবস্তু তাদের দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেছে। তাদের ঘোলা চোখ নিথর রনির দিকে স্থির। যে ছেলেটা খানিক আগে হাঁটাচলা করতে দেখেছে, হৈহল্লা করতে দেখেছে, প্রতিবাদে ফেটে পড়তে দেখেছে, সে কিনা এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে! নাকি লড়াই ক্ষ্যান্ত দিয়ে প্রাণটাকে যমের হাতে তুলে দিয়েছে!

নিথর রনির দিকে এগিয়ে গেল মঈন। মাথার কাছে হাঁটুগেড়ে বসল। হাত রাখল বুকে। কানটাকে একবার বুকের ওপর ঠেকাল। বুকের ওঠানামা এখনো আছে কিনা, নিঃশ্বাস এখনো পড়ছে কিনা, ভালো করে দেখল। পাগলের মতো সে এসব কাণ্ড করে। ধীরে ধীরে তার শরীরে কাঁপুনি ওঠে। রক্তনালিতে রক্তের বান ডাকে। ঘোরের মধ্যে সে তালেবের ডাক শুনতে পায়, 'সরে আয় মঈন, সরে আয়।' মঈন সরে না। কাঁপতে কাঁপতে বিপন্ন চোখে একবার রনির রক্তাক্ত মুখের দিকে তাকায়, আবার

তাকায় তালেবের ভয়ার্ত মুখের দিকে। কী যেন বলার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। তার বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। তার চোখের ভাষা বুঝতে পারে তালেব। মঈন তাকে বলার চেষ্টা করছে, 'আয় তালেব, জলদি আয়। আমাদেরই মতো একটা মানুষ মরে যাচ্ছে। আয়, আমরা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করি।'

ডেগার হাতে তখন স্টাফ কেবিন থেকে সেই প্রহরীকে ছুটে আসতে দেখে মঈন চিৎকার করে ওঠে। বাঘের কবলে পড়ে মানুষ যেভাবে চিৎকার করে ঠিক সেভাবে। যাত্রীরা প্রহরীকে থামানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। প্রহরী ঠিক একইভাবে, রনির মাথায় যেভাবে আঘাত করেছিল, মঈনের মাথায়ও প্রচণ্ড একটা আঘাত করল। আঘাতটা ফস্কে মঈনের বাহুতে লাগল। বাহুর হাড়গোড় বুঝি সব চুরমার হয়ে গেল। ভয়ার্ত মঈন হেজের সিঁড়ির দিকে ছুট লাগায়। মানুষের ভিড় ঠেলে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। প্রহরী ছুটে এসে পেছন থেকে শার্টের কলারটা চেপে ধরল। যাত্রীরা সরে দাঁড়াল। যেন সার্কাস চলছে, তারা সার্কাসের নীরব দর্শক, দেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই কারো। কী করবে? তারা তো আদম। তাদের হাত নেই, পা নেই, মুখ নেই, আছে কেবল পেঁচার মতো দুটি চোখ। অপলক চোখে তারা দেখে, মঈনকে টানতে টানতে দেয়ানি হলের ওপর দাঁড় করাল প্রহরী। কেবিন থেকে দ্রুত পায়ে মাস্টার নামল। হেজের ছাদে দাঁড়িয়ে রিভলভারটা তাক করে ট্রিগার চাপল। গুলিটা কোথায় লাগল কেউ ঠাওর করতে পারল না। মাস্টারও না। সুকানি গ্রিজার বা প্রহরীরাও না। মঈনের আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল গুলির শব্দে। জাহাজের পেছনে উড়ন্ত গাঙচিলেরা দূরে সরে গেল। ঢেউমত্ত সাগর মঈনকে টেনে নিল তার গভীর উদরে।

রনির ফাটা মাথার রক্তধারা গড়িয়ে হেজের গলিতে ছুইয়ে পড়ছে। রক্তধারার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে পাগলের মতো হঠাৎ ছোটাছুটি শুরু করল কাশু বুড়ো। 'হায় হায়, মরি গিইয়্যে, হায় হায়' বলতে বলতে হেজে ছুটে গেল। খানিক পর বেরিয়ে এলো একটা গামছা হাতে। রনির সিথানে বসে তার রক্তাক্ত মাথাটা গামছায় পেঁচাতে শুরু করল। কিন্তু এত রক্ত! রক্তে তার দুই হাত ভিজে গেল, লাল গামছাটা আরো লাল হয়ে উঠল। রক্তের ওপর বসে, রনির মাথাটা নিজের কোলে নিয়ে হু হু করে কাঁদতে শুরু করল বুড়ো। আর তখন ভেসে এলো মাস্টারের হুঙ্কার। একটা নিহত মানুষের জন্য শোক করাটা তার চোখে ঘোরতর অপরাধ। সে এই জাহাজের মালিক, পাঁচশ একাশিজন আদমের হর্তাকর্তা। তার যেমন খুশি আদমদের সঙ্গে তেমন ব্যবহার করবে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে নিহতের জন্য কাশু কেন শোক করবে?

স্টাফ কেবিন থেকে কজিকাটা মাসুক ছুটে এল। কাশুর পিঠে প্রচণ্ড একটা লাথি মেরে বলল, 'মায়া চোদাস মাদারচোদ। ভাগ মাদারচোদ, ভাগ।' কাশু নড়ল না। রনির মাথাটা বুকে নিয়ে আরো জোরে কাঁদতে লাগল, নিহত পুত্রের লাশ বুকে নিয়ে পিতা যেমন কাঁদে, সোহরাবের লাশ বুকে নিয়ে যেমন কেঁদেছিল রুস্তম। পাঞ্জাবির কলার ধরে টানতে টানতে মাঝি তাকে ম্যানহোলের সিঁড়ির মুখে নিয়ে এলো। কাশু সিঁড়িতে পা রাখতে যাবে, অমনি পেছন থেকে মারল আরেকটা লাথি। কাশু মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত হেজে নেমে গেল। বিস্মিত যাত্রীরা দ্বিগুণ বিস্ময়ে দেখল ডেগারধারী প্রহরী এসে রনির পেটে ডেগারটা ঢুকিয়ে জোরসে মারল টান। যেন কোরবানির গরুর ভুঁড়ি কাটছে। গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল। এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তালেবের মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, ধরার মতো হাতের কাছে কিছু খুঁজে পায় না, কেবিনের সিঁড়ির গোড়ায় ধপাস করে পড়ে যায়। জুলফিকার তার সিথানে বসে দোয়া-দরুদ পড়তে পড়তে মাথায় হাত বুলায়, মুখে ছিটা দেওয়ার জন্য এক মগ পানি চায়। কেউ নড়ে না। নড়বে কী করে, নড়ার মতো শক্তি তো থাকতে হবে।

কাঁপতে কাঁপতে আবার উপরে উঠে এলো কাশু। সারা গায়ে রক্ত। যাত্রীরা সরে তাকে জায়গা করে দিল। দুই প্রহরী তখন রনির লাশটাকে টেনে তুলে চ্যাঙদোলা করে সাগরে ছুড়ে ফেলল। হায় হায় করে উঠল কাশু। ভিড় ঠেলে স্টাফ কেবিনে ঢুকে প্লাস্টিকের টেবিলটায় দাঁড়িয়ে ফোটবাড়ির ফোকর দিয়ে ঘূর্ণমান জলে রনির লাশটা খুঁজতে লাগল। কিন্তু পেটকাটা লাশ কি আর জলে ভাসে? অথৈ জলের অতলে এতক্ষণে হয়ত হাঙ্গর-কুমিরে খুবলাতে শুরু করেছে।

নোনাজল দু'ভাগ করে জাহাজ এগিয়ে চলে। মাস্টার তার রিভলভারটা আঙুলের ডগায় ঘোরাতে ঘোরাতে কেবিনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সবাইকে হুঁশিয়ার করে যে, জাহাজ গন্তব্যে পৌঁছার আগে কেউ যদি অকারণে ছাদে ওঠে তার পরিণতিও এমন হবে। যেমন হয়েছে রনির, যেমন হয়েছে মঈনের। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবাইকে সে ছাদ খালি করার নির্দেশ দেয়। কেউ কি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? পরাজিত যোদ্ধার মতো মাথা হেঁট করে একে একে সবাই নিচে নামতে থাকে। তাদের মুখ ধোয়ার দরকার ছিল, সে কথা ভুলে গেছে। তাদের তৃষ্ণা লেগেছিল, সে কথা ভুলে গেছে। তাদের পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা, সে কথাও ভুলে গেছে। দুটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড তাদের সব ক্ষুধা তৃষ্ণা, সব চাওয়া পাওয়া মিটিয়ে দিয়েছে। হেজের গুমোট অন্ধকারে তারা নির্বাক বসে থাকে। কেউ কথা বলার শক্তি পায় না। যেন তারা কথা বলতে ভুলে গেছে, যেন তারা আজন্মের বোবা, কোনোদিন কথা বলেনি, ভবিষ্যতেও কোনোদিন বলবে না। জাহাজ গন্তব্যে না পৌঁছা পর্যন্ত এভাবেই নির্বাক বসে থাকবে, ভুলেও কেউ ওপরে ওঠার চেষ্টা করবে না।

কিন্তু নিচে তো কোনো টয়লেট নেই। তারা তো মানুষ। গোয়ালের গরু-ছাগলের মতো শোয়ার জায়গায় তো আর পায়খানা-পেশাব করতে পারে না। তাই ওপরে উঠতেই হয়। ভয়ে ভয়ে। কাজ শেষ করে দ্রুত আবার নেমে যায়। প্রহরীরা সামনে পড়ে গেলে ভুলেও মুখের দিকে তাকায় না। তাকালেও দ্রুত চোখ সরিয়ে নেয়। যেন তারা চোর। ধরা পড়লে রক্ষা নেই।

আলোর রথে চড়ে বেলা এগোয়। কতটা এগোয় কেউ টের পায় না। দুপুর না বিকেল আন্দাজ করতে পারে না। হয়ত দুপুর। নইলে খাবারের ডাক পড়বে কেন। গত দিনের মতো আবার তারা পালা করে স্টাফ কেবিনে যায়। বাবুর্চির চোখের দিকে কেউ ভুলেও তাকায় না। পলিথিনের ঠোঙায় দু-মুঠো ভাত আর দুটি করে পোড়া মরিচ গোগ্রাসে খায়। একটিবারও কেউ তরকারির কথা জিজ্ঞেস করে না, ভুলেও কেউ আরেক মুঠ ভাত দাবি করে না, ভুলেও কেউ আরেক মগ পানি চায় না। সারা দিনে যদি একটা দানাও খেতে না দেয়, তবু কেউ কিচ্ছু বলবে না। দু-একদিন না খেলে মানুষ মরে না। খেতে চাইলে মরবে, কথা বললে মরবে। অতএব চুপ। জুলফিকার চুপ, ওসমান চুপ, দীপঙ্কর চুপ, কমলও চুপ। ঠোঙা হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তালেবও খায়। ভাতের সঙ্গে সে অশ্রুও খায়। চোখের অঝোর বর্ষণটা থামানোর চেষ্টা করেও পারে না। পোড়া চোখে এত জল, কিছুতেই থামে না, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে ভাতের ঠোঙায়।

কথা বলে শুধু একজন, কাশু বুড়ো। সে খায় আর বকে,

এত গোশত খাইয়্যুম ক্যাংগরি? দাঁতর নিচত খালি কেঁচা গোশতের টুরা পড়ের। কেঁচা গোশত ক্যাংকরি খায় মাইনষে বা'জি? এক্কানা ধোন দরকার না আছিল? রক্ত লাগি রইয়ে...রক্ত।'

কেউ তার কথা শুনতে পায় না। শুনলেও পাত্তা দেয় না। ভাবে, লোকটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ। নইলে কাঁচা গোশতের কথা বলছে কেন? জাহাজে যারা আগে উঠেছে তারা জানে লোকটা যে সারাক্ষণ শুধু বকবক করে। প্রথম যেদিন জাহাজে ওঠে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে যাত্রীদের সোহরাব-রুস্তমের কাহিনি শোনায়। শুনতে শুনতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তবু তার কাহিনি থামে না। সেদিনই তারা সন্দেহ করেছিল লোকটার মাথায় নিশ্চয়ই গল্পগোল আছে। নইলে রাত জেগে কেউ একা একা বকে? কাস্টর কথা কমলের বুঝতে অসুবিধা হয় না। খেতে খেতে সে কাশুর মুখের দিকে তাকায়। জামা-কাপড়ে যেন রক্তের দাগ লেগে আছে। ধুয়েছে। কিন্তু রক্তের দাগ কি সহজে মোছে? কাঁচা রক্তের দাগ দেখে কমলের খাবারে অরুচি এল। অর্ধেক ভাত খেয়েছে, বাকি অর্ধেক আর গিলতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু না গিলে উপায় কী? আবার কখন খেতে দেওয়া তার তো কোনো ঠিক নেই। জোর করে তাই শুকনো ভাতগুলো পেটে চালান করে। প্রতিটি গ্রাস মুখে তোলার সময় হাতটা থরথর করে কাঁপে। নিজের কম্পমান হাতের দিকে তাকিয়ে তার অবাক লাগে। নিজমনে বলে, 'আমি কি বুড়ো হয়ে গেলাম? আমার বয়স কি আশি-নব্বই হয়ে গেল? আমি কি মৃত্যুপথযাত্রী?' আয়না থাকলে চেহারাটা একবার দেখে নিত একটি লাঠি, একটি রিভলভার আর সমুদ্রে ছুড়ে ফেলা দুটি লাশ তাকে তাড়াতে তাড়াতে জীবনের শেষ প্রান্তে নিয়ে এলো কিনা। জীবনে সে অনেক মৃত্যু দেখেছে। বাসে চাপা পড়া মানুষের মাথা থেঁতলে মগজ ছিটকে যেতে দেখেছে, ট্রেনে কাটা পাড়া মানুষের দ্বিখণ্ডিত লাশ

দেখেছে, হাসপাতালের মর্গে দুর্ঘটনায় আর ধর্মান্ধ জঙ্গির ভয়ংকর চাপাতির আঘাতে নিহত বহু বীভৎস লাশ দেখেছে। কিন্তু নিজের চোখের সামনে এমন নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড এই প্রথম দেখল। মানুষ মানুষকে এভাবে মেরে ফেলতে পারে! এত নিষ্ঠুরভাবে! এত নির্মমভাবে! মানুষের জীবন কি তবে এতই মামুলি? ফুঁ দিলেই উড়ে যায়?

খাওয়া শেষে অবসাদগ্রস্ত যাত্রীরা যখন ঘুমায়, অথবা ঘুমের ভান করে যখন চোখ বুজে থাকে, অথবা চোখ বুঝে অন্ধকারে যমের হাতছানি টের পেয়ে চোখ দুটি খুলে রেখে আকাশ-পাতাল ভাবে, কমল তার পিঠের ব্যাগ থেকে কলম আর ডায়েরিটা বের করে। একটা পাতায় লেখে, 'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ, এই প্রবাদ মিথ্যা। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, এই প্রবাদও মিথ্যা। মানবসভ্যতা মিথ্যা। মানুষ কোনোকালে সভ্য ছিল না। জন্মগতভাবেই মানুষ বর্বর। রক্তের সঙ্গে মানুষ বর্বরতা বহন করে চলেছে। মানুষ আর একটা সিংহের মধ্যে, মানুষ আর একটা বাঘের মধ্যে, মানুষ আর একটা হায়েনার মধ্যে কোনো ফারাক নেই। মানুষ এখনো পশুত্বের সীমা অতিক্রম করতে পারেনি। কোনোদিন পারবে কিনা তার কোনো ঠিক নেই।'

দুই.

কাশু বুড়োকে দেখে নাক সিঁটকায়, দূরে দূরে থাকে, কথা বলতে চাইলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার মনে কত কথা জমে আছে, কথার চাপে বুকটা ভারী হয়ে আছে, অথচ কেউ কিনা তার কথা শুনতেই চায় না! রক্তাক্ত পাঞ্জাবি আর লুঙ্গিটা বদলে নিয়েছে, তবুও কেউ তার কাছে ঘেঁষে না। যেন সে মানুষ নয়, দুর্গন্ধে ভরা আস্ত একটা ময়লার ঝুড়ি। তাকালেই যেন পেট উল্টে বমি আসতে চায়। কাউকে নিজের কথা শোনাতে না পেরে এক কোনায় বসে নিজ মনে বকে কাশু। যেন নিজেকেই শোনায়। কী সব বলে কারো বোঝার সাধ্য নেই। বোঝার কেউ চেষ্টাও করে না। দুপুরের দিকে কমলের গা ঘেঁষে বসল কাশু। ডায়েরিতে লিখছিল কমল। মুখ তুলে কাশুর দিকে তাকাল। কাশু ঠোঁট দুটো যতটা পারে চ্যাপ্টা করে হাসল। কমল আবার লেখায় মনোযোগ দিল। শার্টের পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে মুখে নিল কাশু। আড়চোখে একবার কমলের মুখের দিকে তাকিয়ে কী বুঝে বিড়িটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'নেও বা'জি, টানো। শেষে আঁরে দুই টান দিও।'

কৃতজ্ঞতায় কমলের মাথাটা নুয়ে এলো। হেসে বলল, 'থ্যাঙ্কু আঙ্কেল।' বিড়ি নয়, যেন সাত রাজার ধন পেয়েছে সে। বিড়িটাতে আগুন ধরাল। নেশার তীব্রতায় হাতটা তিরতির করে কাঁপে। পারলে তো এক টানেই গোটা বিড়ি ছাই করে দেয়। ঘন ঘন কয়েক টান দিয়ে নাকেমুখে ধোঁয়া ছাড়ল। মাথাটা কেমন ঝিঁঝিঁ করে উঠল। খানিকের জন্য সব দুঃখ-কষ্ট যেন পানি হয়ে গেল। ভয় অবশ্য আরো আগেই সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছে। যা হয় হোক। কিছু হওয়া না হওয়া নিয়ে তার ভেতর এখন আর এত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নেই। বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়া নিয়ে ভাবছে না। মরতে তো একদিন হবেই। দুটি মৃত্যু দেখে, যাত্রীদের এমন দুর্ভোগ, মানবতার এমন অপমান দেখে ভয় সে পেয়েছে, তবে ভয়কে এখন জয় করে নিয়েছে। মরলে একবারই মরবে, কাপুরুষের মতো বারবার মরবে না। কী হবে তার? ভবিষ্যতের দিনগুলোতে কী কী হতে পারে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ সে ডায়েরিতে টুকে রেখেছে, 'হয়ত আর কোনোদিন দেশে ফিরতে পারব না, হয়ত আর কোনোদিন লাবনীর মুখ দেখতে পাব না, বাকি জীবনটা হয়ত যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির মতো কোনো কারাগারে অথবা রবিনসন ক্রুসোর মতো নির্জন কোনো দ্বীপে কাটিয়ে দিতে হবে। কে জানে, রনি বা মঈনের মতো জাহাজিরা আমাকেও হত্যা করতে পারে, জাহাজডুবিতে আমার সলিল সমাধিও ঘটতে পারে, লাশটা তিমি ডলপিন বা হাঙর কুমিরের পেটে চলে যেতে পারে। যাক। পৃথিবীতে প্রতিদিন কত শত মানুষ মরছে। ধর্মের জন্য, তত্ত্বের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, লোভ-লালসার জন্য মানুষের হাতে মানুষ খুন হচ্ছে, দুর্ঘটনায় মানুষ মরছে, রোগে শোকে বার্ধক্যে মরছে। এই মৃত্যুর মিছিলে তো আমিও থাকতে পারি। থাকাটা আশ্চর্যের কিছু নয়। আমি এখনো বেঁচে আছি, আশ্চর্য বরং এটাই। কে জানে, এমনও হতে পারে, আমি বেঁচে যাব। অডিসিউসের মতো একদিন আবার দেশে ফিরে যাব। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগাম কোনো ধারণাই যেহেতু করতে পারছি না ভবিষ্যৎ নিয়ে তাই এত ভাবনা-চিন্তার কিছু নাই। এক জীবনে মানুষ কত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়। এমভি সাউথ বেঙ্গল-৩-এর এই কঠিন সময়টাও জীবনের এক অভিজ্ঞতা। হয়ত এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনকে পূর্ণতা দেবে, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাকে আরো প্রাজ্ঞ করে তুলবে।'

বিড়ির গন্ধ পেয়ে দীপঙ্কর ছুটে এলো। বিড়ির অর্ধেকটা টেনে কাশুকে দিয়েছে কমল। কাশু আরামসে সুখটান মারছে। পোষা বেড়ালের মতো কাশুর সামনে উবু হয়ে বসল দীপঙ্কর। হাতে হাত ঘষে, মাথা চুলকায়, একটা হাত বাড়িয়ে ধরে তার দিকে। কাশু ঘাড় বাঁকিয়ে কপাল কুঁচকায়। তার মানে বিড়ি সে দেবে না। পকেট থেকে বিড়ির খালি একটা ঠোঙা বের করে বলল, 'কডে পাইয়্যুম? এই চ না, একখানও নাই।'

দীপঙ্কর অনুনয় করে, 'শুধু দুই টান চাচা, প্লিজ।'

প্লিজ শব্দটা শুনেই বুঝি কাশু মজে যায়। খানিকক্ষণ কী যেন ভাবে। দীপঙ্করের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘোলা চোখে একবার কমলের দিকে তাকায়। 'থ্যাঙ্কু' শব্দটা ফের মনে পড়ে বুঝি। মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। আবার দীপঙ্করের দিকে তাকায়। হাসে। মনে বুঝি দয়া আসে। হাসতে হাসতে পোঁটলা থেকে আরেকটা বান্ডিল বের করে দীপঙ্করের হাতে একটা বিড়ি দিয়ে বলে, 'শেষ অই গিইয়ে। বান্ডিলত আর উনিশ গা আছে, কিয়রে ন দিইয়্যুম। বিড়ি ছাড়া আঁই বাঁচিন ন পারি। উয়াস থাইকতে রাজি আছি, কিন্তু বিড়ি খা পরিবোই পরিবো।'

বিড়িটা ধরিয়ে দীপঙ্কর চোখ বন্ধ করে টান মারে। শব্দ করে ধোঁয়া ছাড়ে। তামাকপোড়া গন্ধ পেয়ে আরো কজন যাত্রী বিড়ি ধরায়। হেজজুড়ে পাক খায় ধোঁয়া। জুলফিকার মুখ গোমড়া করে বলে, 'গোন্দে তো আর থাকপের পাচ্চি নে, বারে যায়ে খাওয়া যায় না?' কে শুনে তার কথা! দীপঙ্কর শুনেও না শোনার ভান করে থাকে। জুলফিকার কেন, সামনে এখন যম এসে দাঁড়ালেও তাকিয়ে দেখবে না। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলবে, আগে বিড়িটা শেষ করি, তারপর যা করার করো ভাই। জুলফিকার চোখ বন্ধ করে গভীর এবাদতে মশগুল মুসল্লির মতো দুলছে। নিঃশব্দে জিকির করছে। তার মাথার ভেতরে হয়ত ঘুরপাক খাচ্ছে 'নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ।' মৃত্যুকে হয়ত সে ঘাড়ের কাছে টের পাচ্ছে। হয়ত দোযখের দৃশ্য চোখে ভাসছে। হয়ত ভাবছে, দোযখ বুঝি এমন? এমন বিভীষিকাময়! এমন ধোঁয়াচ্ছন্ন!

বিড়ি টানতে টানতে গেজাতে শুরু করল কাশু। কমলের ডায়েরির মলাটে পড়া বিড়ির ছাই ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বুঝলা বা'জি, আঁর পোয়াও কিন্তু তোঁয়ার মতো শিক্ষিত আছিল। তোঁয়ার মতো এইল্লা লম্বাচওড়া। কেলাশ ফাইভ পাস গজ্জিল্। আহারে পোয়া আঁর, মগেরা তারে মারি ফালায়!'

'মারি ফালায়' কথাটা স্পষ্ট করে বলতে পারল না, কণ্ঠস্বরটা চাপাকান্নায় রুদ্ধ হয়ে এলো। যেন অদৃশ্য কোনো হাত তার কণ্ঠটা চেপে ধরেছে। ঠোঁট দুটো তিরতির করে কাঁপতে লাগল। থুতনিটাও। থুতনির নিচে দাড়ির গোচাটাও। থুতনিটা থেকে চোখ ফেরাতে পারে না কমল। কম্পমান থুতনিটারও যেন একটা ভাষা আছে, যেন সেটি তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলছে, যে ভাষা আদিম, কোনো মানুষের পক্ষে যে ভাষা বোঝা দুঃসাধ্য। কমল বুঝতে পারে। বোঝার মতো বোধ তার আছে। কাশুর পিঠে হাত রেখে সে সান্ত্বনা দেয়, 'কাঁদবেন না চাচা।' তাতে কাশুর নিঃশব্দের কান্না শব্দ পায়। বিড়িটা জ্বলে জ্বলে ছাই হয়। সেদিকে তার খেয়াল নেই। তার বুকে তো এখন শোকের আগুন, বিড়ির আগুন কোন ছার! আঙুল পুড়ে মোমের মতো গলে গেলেও সে টের পাবে না। যাত্রীরা তার দিকে তাকায়। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। জাহাজের প্রতিটি যাত্রীই তো কাঁদে, খানিক পর পরই তো কান্নার শব্দ শোনা যায়। কেউ শোকে, কেউ ভয়ে, কেউ ক্ষুধায়, কেউবা তৃষ্ণায় কাঁদে। এত এত কান্নার মধ্যে কাশুর কান্না আলাদা কোনো গুরুত্ব বহন করে না। তবু জুলফিকার বলে, 'কান্দিবেন না ভাই, আল্লার কাচে মাফ চান। আল্লা রহমানের রহিম। বান্দার ভালো মন্দের দড়ি তার হাতত ধরা।'

'এয়া মাবুদ!' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাশু কান্না থামায়। খানিকক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে থাকে। বুকের ভেতর বেদনার ঘুরন্ত সাইক্লোনটার দুরন্ত গতির রাশ টেনে ধরার চেষ্টা করে। লুঙ্গিতে চোখ মুছে আবার শুরু করে কথা। কতক্ষণ বউয়ের, কতক্ষণ মেয়ের আর কতক্ষণ ছেলের কথা।

বিড়িটা শেষ করে দীপঙ্কর উঠে সিঁড়ির কাছে চলে গেছে। সারাক্ষণ সে ওদিকটায় থাকে। ভেতরে ঢুকলে তার হাঁসফাঁস লাগে, দম বন্ধ হয়ে

আসতে চায়। কমল চুপচাপ কাশুর গেজানি শোনে। কিন্তু কানে কতক্ষণ আর সহ্য হয়? ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই একই কথা। আরাকানের কোথায় কোন রাচিদং গ্রামে তার মোকাম। তার বড়বেটাকে আর্মিরা গুলি করে মেরে লাশটা গাঙে ভাসিয়ে দেয়। চোখে গরম রড ঢুকিয়ে ছোট বেটাকেও মেরে ফেলে মগেরা। বিধবা মেয়েটাকে একদিন ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায় আর্মিরা। র‍্যাপ করে ব্লেড দিয়ে তার যৌনাঙ্গ কেটে ফেলে। রক্তক্ষরণ হতে হতে মরে যায় মেয়েটা। তার লাশটাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। দুনিয়ার বুকে বউ ছাড়া বুড়োর আপন বলতে কেউ আর থাকে না। এক শীতের রাতে কাশতে কাশতে বউটাও মরে যায়। শুধু মৃত্যু আর মৃত্যুর কথা। জীবনের কথা যেন বুড়ো বলতে জানে না।

কমল বলল, 'আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

'মরিবাল্লাই যাইদ্দে বাজি।'

কমল হাসতে হাসতে বলল, 'জেনেশুনে কেউ মরতে যায় চাচা?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে কাশু। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'কডে আর যাইয়্যুম, ছোড ভাইয়র কাছে যাইদ্দে।'

'ভাই কোথায় থাকে?'

'কডে আর থাইবো।' বলে খানিকক্ষণ দম নেয়। আরেক দফা চোখ মুছে বলে, 'মালুইশিয়ায়।'

কাশুর মুখটা এবার ফাল্গুনের মেঘমুক্ত আকাশের মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কালো দাঁতগুলো বের করে আগের মতো আবার হাসে। এবার শুরু করে ভাইয়ের গল্প। ছোটবেলায় মালয়েশিয়া চলে গেছে তার ভাই। কত বছর আগে গেছে আঙুলের কড়া গুনে হিসাব করে। কিন্তু কড়া গুনে বছরের হিসাবটা ঠিক মেলাতে পারে না। শুধু মনে আছে, যে বছর আরাকানে অপারেশন পিথায়া শুরু হয়, যে বছর শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মেজর এঁকো রোহিঙ্গাদের সমস্ত কবরস্থান ও মাদ্রাসা দখলের হুকুম দেয়, সেই বছর, শীতকাল ছিল, একদল রোহিঙ্গার সঙ্গে ট্রলারে চড়ে নিরুদ্দেশে পাড়ি জমায় তার ভাই। প্রায় দু-বছর থাইল্যান্ডে ছিল। দালাল ধরে বহু কষ্টে মালয়েশিয়া চলে যায়। অনেক কষ্ট করেছে জীবনে। এখন সুখে আছে। বিয়েশাদি করে সংসারি হয়েছে। রাবার বাগানে চাকরি করে টাকাপয়সা ভালোই কামাচ্ছে। ছেলেটা বড় হয়েছে। মেয়েও আছে একটা।

কথা বলতে বলতে কাশুর কষে ফেনা জমে যায়, মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। কমলের গা রিরি করে। উঠে সে দীপঙ্করের কাছে এসে দাঁড়ায়। বেহায়ার মতো তার পিছে পিছে কাশুও আসে। ভাইয়ের গল্প থামে না তার। ভাইটা যেন আরব্য রজনীর সিন্দাবাদ, যে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দূরদেশে গিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে। বিরক্ত কমল টয়লেটে যাওয়ার নাম করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। তার পিছে দীপঙ্করও।

কাশু কী আর করে, আগের জায়গায় ফিরে নিজমনে বকতে শুরু করে। জুলফিকার ততক্ষণে আসর জমিয়ে তুলেছে। বগুড়ার কোন এক মাদ্রাসার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলে ওয়াজ করতে কোথা থেকে এক মুফতি আসত। বেদ-উপনিষদের শত শত শ্লোক তার মুখস্থ ছিল। ওয়াজে সেসব শ্লোক দিয়ে সে হিন্দু ধর্মকে খারিজ করে দিত। যাত্রীদের কাছে সেই মুফতিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন আলেমে দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে জুলফিকার বলতে শুরু করে গুয়ান্তানামো বে কারাগারে তার উপোস থাকার দিনগুলোর কাহিনি। মুগ্ধ শ্রোতারা তার কাহিনির ফাঁদে পড়ে ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভুলে আছে। কাশুর তাতে হিংসে হয়। জুলফিকারের মতো সেও তো কথা বলতে চায়। তার নিজের কথা কেউ না শুনুক, সোহরাব-রুস্তমের কাহিনিটা কি শুনতে পারে না? যখন তার সুদিন ছিল, যখন বউ-বাচ্চারা বেঁচে ছিল, বাড়ির উঠানে এরকম কত আসর বসিয়ে কত রাত জেগে পাড়ার মানুষকে সোহরাব-রুস্তমের কাহিনি শুনিয়েছে। জুলফিকারের জমানো আসর দেখে সেসব দিনের কথা মনে পড়ে যায়। মাঝে মধ্যে হাঁক দিয়ে সে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না, এক মনে সবাই জুলফিকারের কথা শুনছে আর মাঝে মধ্যে আমেরিকার কাফের সৈন্যদের গালি দিচ্ছে। কাশুর মাথায় জেদ চেপে যায়। সবাইকে তার শত্রু মনে হয়। শত্রুদের কাছে এক মুহূর্তও আর থাকতে ইচ্ছে করে না।

রাত প্রায় দশটায়, সবাই যখন খাবারের আশা ছেড়ে দেয়, পোঁটলাটা বগলদাবা করে কাশু চেঁচিয়ে বলে, 'থাকো তোঁয়ারা, আঁই যাইরগই। এই মুখে আর ন দেখাইয়্যুম তোঁয়ারারে।'

ছাদে উঠল কাশু। পেশাবের বেগ পেয়েছে খুব। আন্নির টয়লেটে ঢুকে

পেশাব করতে বসল। পেশাবের বদলে শুরু করল রক্তবমি। গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল। নাকে-মুখে সমান তালে। রক্ত দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। মাথাটা শাঁই-শাঁই করে ঘুরতে লাগল। যমের ধাওয়া খেয়ে দ্রুত টয়লেট থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়ল এক নম্বর হেজে। যাত্রীরা তাকে দেখে নড়েচড়ে বসে, সরে জায়গা করে দেয়। ভালোবাসায় নয়, শ্রদ্ধায় নয়, ঘৃণায়। সকালে একটা মৃত মানুষের রক্তে যার হাত লাল হয়ে গিয়েছিল তার প্রতি ঘৃণা কি এত তাড়াতাড়ি দূর হয়? রক্তকে মানুষ ভালোবাসে, আবার ঘৃণাও করে। নিজের শিরায় যে রক্তনদী বয়ে চলেছে তার প্রতি মানুষের অগাধ ভালোবাসা। কিন্তু অন্যের রক্তে তার ভীষণ ঘৃণা। কাশুর দাড়িতে কাঁচা রক্তের চোপ, শরীরে রক্তের গন্ধ। বাতির ক্ষীণ আলোয় তার রক্তমাখা লাল দাড়ি কেউ ঠিক খেয়াল করতে না পারলেও গন্ধটা টের পাচ্ছে। গন্ধটা যাদের নাকে লাগে ঘৃণায় তারা আরো দূরে সরে বসে। মনে মনে গালি দেয়, 'শালার বুড়া খাটাস এখানে কেন? ভাগ শালা এখান থেকে!'

অন্য সময় হলে নিজের প্রতি মানুষের এই ঘৃণাবোধ টের পেত কাশু। এখন তো সে আর তার মধ্যে নেই। হেজের সিলিংয়ে জ্বলন্ত বাতিটার দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। ভীষণ বিমর্ষ দেখাচ্ছে তাকে। সারা পৃথিবীটা মাথায় নিয়ে ঘুরছে। বাতিটা ঘুরছে, তার সামনে মানুষরা ঘুরছে, চটের পর্দাটা ঘুরছে, গোটা জাহাজটা ঘুরছে, অতল সমুদ্রের অজস্র জলরাশি ঘুরতে ঘুরতে আসমানের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বাতিটা থেকে তার চোখ সরে না। আজরাইল যেন বাতিটায় বসে তাকে ডাকছে, 'সময় ফুরিয়ে গেছে কাশু, আয় আয়, চলে আয়।' বাতিটায় তার মৃত স্ত্রী-সন্তানের মুখ দেখতে পায়। তারা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, 'চলে আসো...তাড়াতাড়ি...তাড়াতাড়ি। এই যে আমরা তোমাকে নিতে এসেছি। চলে আসো...দেরি করো না...চলে আসো।'

কাশু কেমন করে এই ডাক উপেক্ষা করে? সে সামনে হাঁটতে চায়, কিন্তু পা যে চলে না! পা দুটো যেন পাথর হয়ে গেছে। যেন হাজার বছর ধরে এই মণ মণ ওজনের পাথরখণ্ড নিয়ে সে দাঁড়িয়ে। বাতিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কিছুই সে আর স্পষ্ট দেখতে পায় না। ধীরে ধীরে সবকিছু অন্ধকার হতে থাকে।

হঠাৎ সে বসে পড়ে। দু-হাতে ঠেস দিয়ে কয়েক মুহূর্ত বসে থাকে। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে। যাত্রীরা কেউ শুয়ে, কেউ বসে। তার দিকে কারো খেয়াল নেই, সবার দৃষ্টি সিঁড়ির দিকে। এই বুঝি খাবারের ডাক পড়ল। এই বুঝি খাবার নিয়ে বাবুর্চি আর প্রহরীরা নামল। সবাই আশা করেছিল সন্ধ্যায় আবার ভাত দেবে। ভাত না দিলে অন্তত চিড়া-গুড় দেবে। রাত প্রায় আটটা বেজে যাচ্ছে, অথচ এখনো খাবারের ডাক পড়ল না, খাবার নিয়ে কেউ এলো না। ওপরে গিয়ে খাবার চাইবে সেই সাহসও কেউ পাচ্ছে না। কে চায় মার খেতে? মরতে? বসে বসে তাই অপেক্ষা করছে। নিঃশব্দ অপেক্ষা। সিঁড়ির গোড়ায় কারো পায়ের শব্দ শোনা গেলে চকিতে তাকাচ্ছে। এই বুঝি খাবার নিয়ে কেউ নামল।

অপেক্ষা করতে করতে ঘুমের জোয়ারে চোখ যখন ভারী হয়ে ওঠে, হঠাৎ তারা কাশু বুড়োর লম্বা লম্বা শ্বাস টানার শব্দ টের পায়। খর খর...খর খর...খর খর। তারা ভাবে, হয়ত ঘুমের ঘোরে নাক ডাকছে বুড়ো। কিন্তু কাছ থেকে যারা মানুষের মৃত্যু দেখেছে কাশুর শ্বাস তাদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে। একজন দুজন করে তার চারপাশে তার ভিড় জমায়। গুঞ্জন ওঠে। কাশুর মুখ থেকে রক্তাধারা গড়িয়ে পড়তে দেখে তার বয়সী এক লোক বিড়বিড় করে আওড়ায়, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।'

'কী অইয়ে! মরি গিইয়্যাই নাকি?'

'ইশটোক অইয়্যে মনে অয়।'

সহসা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে হেজজুড়ে। আতঙ্কিত যাত্রীরা একে একে মুমূর্ষু কাশুর কাছ থেকে দূরে সরতে থাকে। সরতে সরতে খোঁয়াড়ের হাঁস-মুরগির মতো এক কোনায় জড়ো হয়। গভীর রাতে যেন শেয়াল হানা দিয়েছে খোঁয়াড়ে। মৃত্যুর কথা শুনে চটের পর্দার আড়ালে মহিলারা কান্না জুড়ে দেয়। শোকে নয়, ভয়ে। এপাশ থেকে কেউ একজন ধমকে ওঠে, 'চুপ করো তোমরা।' ধমক শুনে তাদের কান্না আরো গতি পায়। যেন তুষের আগুন, ফু দিলেই উসকে ওঠে। কেউ কেউ সশব্দে কালেমা পড়তে থাকে। আট মাসের গর্ভবতী রোহিঙ্গা ইয়াসমিন, স্বামী, শাশুড়ি আর দেবরের সঙ্গে যে মালয়েশিয়া যাচ্ছে, কাপড়-চোপড়ের ব্যাগটা কোলে রেখে তার ওপর মাথা ঠেকিয়ে ফোঁপাচ্ছে। তার গায়ে এখন আর বোরকা নেই। কার গায়েই-বা আছে? কার বোরকা কোথায় তারও কোনো হদিস নেই। ভ্যাপসা গরমে অস্থির, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর আর মৃত্যুভয়ে তটস্থ থাকলে পর্দা-পুশিদার কথা কি আর খেয়ালে থাকে? কে এগানা কে বেগানা এত কিছু বাছবিচারের কি ফুরসত থাকে?

এক লোক দৌড়ে ওপরে উঠে প্রহরীদের খবর দিল, 'আসেন ভাই আসেন, লোকটা মরে যাচ্ছে।' প্রহরীরা ধমক দিয়ে তাকে নিচে পাঠিয়ে দিল। মরছে তো তাদের কী করার আছে। তারা কি ডাক্তার? হায়াত-মওত কি তাদের হাতে? কেউ মরে গেলে ধরে ওপরে তুলে সাগরে ফেলে দিলেই তো ঝামেলা খতম। তা ছাড়া তারা তখন মৌজে মত্ত। মদের নেশায় চুর। বাবুর্চি গলা পর্যন্ত গিলে একেবারে টাল। মাস্টারব্রিজের ছাদে উঠে থাইল্যান্ডের আদমকারবারি পাজুবান অংকাচোতেফানের মা-বোন ধরে গালাগাল করছে। স্টাফ কেবিন থেকে ভেসে আসছে রোহিঙ্গা রশিদার গোঙানি। বয়স প্রায় একুশ। স্বামী মালয়েশিয়ায়। তার মুখের দিকে তাকালে কমলের মতো ইতিহাস-সচেতন যে কারো মনে পড়ে যাবে ফিরিঙ্গিদের কথা। বিয়ের দু-মাস পর তার স্বামী বিদেশ চলে গেছে। রাবার বাগানে চাকরি করছে প্রায় চার বছর। বউকে নিজের কাছে নিতে দালালের মাধ্যমে পাজুবানকে নগদ এক লাখ টাকা দিয়েছে, ঠিকঠাক মতো পৌঁছলে আরো পঞ্চাশ হাজার দেবে। স্বামীর সঙ্গে তার শেষ কথা হয়েছে জাহাজে ওঠার আগের দিন, ফোনে। স্বামী বলেছে, 'কোনো চিন্তা করো না, তারা ঠিকঠাকমতো তোমাকে পৌঁছে দেবে, আমি সব ব্যবস্থা করেছি।'

কিন্তু সে তো যুবতী। শরীরে তার রাধাচূড়ার আগুন। দ্বিগুণ ঔজ্জ্বল্য নিয়ে এই আগুন অন্ধকারেও জ্বলে। কাশু হেজে নামার পর আন্নির টয়লেটে গিয়েছিল রশিদা। টয়লেট থেকে বের হওয়ার পর তার পথ আগলে দাঁড়ায় মাস্টার। ভয়ে বুকে হাত রাখে রশিদ। কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। দৌড়ে পালাবে সেই সাহসও পায় না। পেছন থেকে যদি গুলি করে দেয়! মাস্টার হি হি করে হাসে। রশিদার মনে হয়, অন্ধকারে যেন ভূত হাসছে। পাশ কাটিয়ে সে সামনে হাঁটা ধরলে মাস্টার তাকে ঝাপটে ধরে। নেকাবটা একটানে সরিয়ে দাঁতালের মতো তার মুখে চুমু খায়, দু-হাতে বুকটা খামচে ধরে। খিদায় ক্লান্ত রশিদা শরীরে যেটুকু শক্তি ছিল সবটুকু দিয়ে বাধা দেয়। কিন্তু পুরুষের সঙ্গে নারী আর কতক্ষণ টিকতে পারে! সে চিৎকার করতে গেলে মাস্টার এক হাতে তার মুখটা চেপে ধরে শাঁসায়, সকালের দুই হত্যাকাণ্ডের কথা মনে করিয়ে দেয়। সে আর চিৎকার করতে পারে না, চাপাশব্দে কেবল কাঁদে। মাস্টার তার বোরখার বোতামগুলো খোলে। রশিদা কাঁদতে কাঁদতে সে শুয়ে পড়ে। দুজন প্রহরী টানতে টানতে তাকে স্টাফ কেবিনে নিয়ে যায়। প্রহরীরা বেরিয়ে গেলে মাস্টার ঢোকে। দরজাটা ভেতর থেকে লাগিয়ে দেয়। তার পায়ে পড়ে রশিদা মিনতি করে, 'অনে আঁর বাপের হোয়ান। দয়া গরি আঁর সব্বনাশ ন গইজ্জন। আঁই অনর দুই প-দ ধরি।' রশিদার আর্তি মাস্টারের কানে ঢোকে না। শামুকের মতো নিজের ভেতরে নিজেকে গুটিয়ে বসে পড়ল রশিদা। মাস্টার তাকে শোয়াতে চায়, কিন্তু পারে না। টানাহেঁচড়া করতে করতে ভীষণ হাঁপিয়ে ওঠে। মাথায় ভীষণ রাগ চাপে। টেবিলের ওপর থেকে পিস্তলটা এনে রশিদার কপালে ঠেকিয়ে জানে খতম করে দেওয়ার হুমকি দেয়। রশিদা দুরন্ত নাগিনীর মতো ফোঁস করে মাস্টারের দিকে ঘোরে। চোখে আশ্চর্য জ্যোতি। চোখ নয়, যেন অগ্নিকুণ্ড। ঘাড়ের কাছে পিস্তল দেখে তার চোখের শিখাটা নিভে যায়, ফণা নেমে যায়। আর একটা কথাও বলে না সে। কাঁদেও না। মাস্টার তার কামিজটা খোলে। স্যালোয়ারটা খোলে। রশিদার স্তন দুটির দিকে তাকিয়ে থাকে। এমন খাড়া স্তন যেন জীবনে দেখেনি। একহাতে একটা স্তন ধরে আরেকটা স্তন চুষতে শুরু করে। রশিদা শুয়ে পড়ে। তার যৌনাঙ্গে হাত রাখে মাস্টার। রশিদা কেঁপে ওঠে। মাস্টারের আর তর সয় না, লুঙ্গিটা তুলে লিঙ্গটা মুঠো করে ধরে রশিদার যৌনাঙ্গে ঠেকিয়ে ঠেলা মারে। রশিদা ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে। কঁকাতে কঁকাতে একটা সময় চুপ মেরে যায়। মাস্টার তার যৌনাঙ্গ ভিজিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। কতক্ষণ শুয়ে থেকে টয়লেটে চলে যায়।

এবার ঢোকে কজিকাটা মাসুক। সে বেরোলে ঢোকে এক সুকানি। তারপর ঢোকে আরেক সুকানি। গুনে গুনে চারজন। সবাই বেরিয়ে গেলে সকালের ডেগারধারী সেই প্রহরী ঢোকে। রশিদার পিঠে প্রচণ্ড একটা লাথি মেরে বলে, 'ওঠ মাগী। ভাগ এখান থেকে।' রশিদা উঠে বসার

চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। কী করে পারবে? শরীরটা তো তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। যেন মাঝিহীন নৌকা। ভাসছে তো ভাসছেই। ঢেউয়ের তালে তালে একবার ওপরে উঠছে, আবার নিচে নামছে। খানিকক্ষণ টানাহেঁচড়া করে প্রহরী বেরিয়ে যায়।

রশিদা হঠাৎ শুনতে পায় দরদী কণ্ঠ, 'ওঠ মা।'

রশিদা নড়েচড়ে ওঠে।

'ওঠ মা।'

রশিদা শরীরটাকে কোনোরকমে টেনে তোলে।

'ধর মা।'

রশিদা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘোলা চোখে তাকায়। বাবুর্চিকে সে চিনতে পারে। তার অবাক লাগে। প্রথম দিন যাকে দেখে অজানা ভয়ে কেঁপে উঠেছিল, যার কুনজর থেকে বাঁচতে সারাক্ষণ নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল, দুপুরে যার হাত থেকে ভাতের ঠোঙাটা নিতে হাতটা একবার কেঁপে উঠেছিল, সেই বাবুর্চি কিনা এখন দু-হাতে শাড়িটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে আছে! বাবুর্চির মুখ থেকে সে চোখ সরাতে পারে না। যেন অবুঝ সন্তান চোখে-মুখে জগতের সমস্ত বিস্ময় নিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

টলতে টলতে হেজে নেমে গেল রশিদা। শোবার জায়গাটুকুতে শরীরটা এলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাতিটা নিভে গেল। নেমে এলো ভয়াল অন্ধকার। যমের সঙ্গে লড়াইরত কাশু বুড়োর লম্বা শ্বাস অন্ধকারকে আরো ভয়াল করে তোলে। যাত্রীদের কেউ কেউ ভয়ে কান্না শুরু করে দেয়। কাপড়ের পুঁটলিটা সিথানে দিয়ে শুয়ে থাকে রশিদা। কোনো শব্দ তার কানে ঢুকছে না। হয়ত ঢুকছে। তবে বাস্তবে নয়, স্বপ্নে। স্বপ্নের মধ্যেই যেন বাতিটা জ্বলে ওঠে। সে চোখ খোলে না। খোলার মতো শক্তি পায় না।

শোরগোল শুনে অন্ধকারে হাতড়ে দু-নম্বর হেজ থেকে ছাদে উঠে এলো কমল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে মাস্তুলের লাইটের ক্ষীণ আলোয় দেখল, তিনজন প্রহরী ধরাধরি করে একটা লোককে এক নম্বর হেজের ছাদে শুইয়ে দিচ্ছে। কে লোকটা? কাশু চাচা? তাই তো মনে হচ্ছে! কাশু বুড়োকে চিনতে ভুল হয় না তার। সে সামনে এগিয়ে গেল। এক প্রহরী ধমকে উঠল, 'এইশ্‌শালা! উপরে কী? জলদি নিচত লাম!'

পেছনে হটে সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে কমল জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে ভাই?'

কেউ তার জিজ্ঞাসার জবাব দিল না।

'দয়া করে বলবেন কী হয়েছে তার?'

খনখনে গলায় এক প্রহরী বলল, 'মরেছে।'

'বলেন কি! কাশু চাচা না?'

প্রহরী নিরুত্তর। কমলের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। হেজের গলি ধরে আন্নির দিকে চলে গেল প্রহরীরা। ইঞ্জিনের গুমগুম শব্দে কাশুর শ্বাস টানার শব্দটা ঠিক শুনতে পায় না কমল। খুব ইচ্ছে করে তার সিথানে গিয়ে বসতে, কী হয়েছে জানতে, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। ডেগারধারী লোকটা যদি তেড়ে আসে! মঙ্গনের মতো তার মাথায়ও যদি বাড়ি মেরে বসে! কমলের ভয়ার্ত চোখ চারদিকে ঘোরে। তার চোখ যায় স্টাফ কেবিনের দিকে। দরজায় দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছে বাবুর্চি। সাহসের সর্বশেষ বিন্দুটাও উবে গেল তার। মাথাটা নুইয়ে ধীর পায়ে সে হেজের অন্ধকারে ঢুকে পড়ল।

পরদিন কাশুকে আর কোথাও খুঁজে পায় না কমল। সকাল থেকে তার চোখ গোপনে শুধু মুমূর্ষু কাশুকে খুঁজে বেড়িয়েছে, এক নম্বর হেজের যাত্রীদের কাছে জানতে চেয়েছে, কাশু বুড়ো সত্যি মরে গেছে, না এখনো বেঁচে আছে? বেঁচে থাকলে কোথায় আছে? মরে গেলে তার লাশটা কোথায় রাখা হয়েছে? সঠিক উত্তরটি কেউ দিতে পারেনি। বেলা বাড়ার পর যাত্রীদের হাতের কোষে যখন এক চামচ করে সেদ্ধ নুডলস দেওয়া হতে থাকে, কমলের পালা এলে, সে দু-হাত বাড়িয়ে নুডলস নিতে নিতে বাবুর্চির কানে কানে বলল, 'কাশু চাচা কোথায় জানেন কিছু?'

বাবুর্চি জবাব তো দিলই না, উল্টো চোখ পাকাল। ভয়ে কমল সরে এলো। নুডলসটুকু খেয়ে এক ঢোকে মগটা খালি করে হেজের গলিতে গিয়ে দাঁড়াল। হেজের ছাদে তখনো রক্তের দাগ। পানি মেরে ধোয়া হয়েছে, তবু পুরোপুরি মোছেনি। তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জুলফিকার ফিসফিস করে বলল, 'শুনিছেন ভাই?'

কমল ঘুরে তাকাল।

'কাশু মিয়া, ওই যে রোহিঙ্গা বুড়হাটা...চিনছেন তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। কোথায় তিনি?'

জুলফিকার মুখটাকে কমলের কানের আরো কাছে এনে আরো মৃদুশব্দে বলল, 'ছুরি দিয়ে প্যাট কাটে সাগরোত ফালে দেচে।'

ডান হাতের তালুটা দুই ঠোঁটে ঠেকিয়ে হাঁ মুখটা আড়াল করল কমল। জুলফিকার ফিসফিসিয়ে আরো কীসব কথা বলে গেল ইঞ্জিনের শব্দে ঠিক বুঝতে পারল না।

সূর্যের তাপ বাড়ছে ধীরে ধীরে। সূর্যকিরণে কমলের চোখে বুঝি জ্বালা ধরে। কতক্ষণ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ঘুরে নিচের জলস্রোতের দিকে তাকাল। নোয়ানো মাথাটা আর তুলতে ইচ্ছে করে না। বহুদিন পর, মায়ের মৃত্যুর পর এই প্রথম, অশ্রুর দুটি বিন্দু দ্রুতবেগে নোনাজলের সিন্ধুতে গড়িয়ে পড়ল।

তিন.

সেদিন দুপুরে একটা দ্বীপের কাছে এক ডুবোচরে আটকে গেল জাহাজ। জাহাজিরা বহু চেষ্টা করেও এক চুল নড়াতে পারে না। পাতা নড়ে না, প্রপেলার ঘোরে না। যেন মৃত এক জলহস্তি। পড়ে আছে তো আছেই। এই পথে মাস্টার বা সুকানিরা আগে কখনো আসেনি, তা নয়। গত তিন বছরে বহুবার যাতায়াত করেছে। কিন্তু সমুদ্রের যেমন কূল-কিনারা নেই, তার রহস্যেরও কূল-কিনারা নেই। তার বুকটা কোথায় উঁচু, কোথায় নিচু, কোথায় ঢেউ কম আর কোথায় বেশি...এত কিছু তো আর খেয়ালে থাকে না। যে নাবিক এক জীবন সমুদ্রে কাটিয়ে দিয়েছে তার পক্ষেও তো সমুদ্রের মতিগতি বোঝা দুষ্কর।

যাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ল, কান্নাকাটির রোল পড়ে গেল। যদি ডুবোচরে জাহাজটা আটকে থাকে মৃত্যু তো তবে নির্ঘাত। এই অকূল দরিয়ায় কে আসবে বাঁচাতে। জুলফিকার ঘন ঘন দোয়া ইউনুস পড়ে, বাকিদেরও পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। ইউনুস নবী কীভাবে এই দোয়া পড়ে মাছের পেট থেকে উদ্ধার পেয়েছিল সেই কাহিনি বর্ণনা করে। কাহিনিটা শুনে যাত্রীদের মনে ভয়ের পাথরটা আরো শক্ত হয়ে ওঠে। তার মুখে মুখে সবাই পড়ে, 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা...।' জাহাজিরা নির্বিকার। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বলতে কিছু নেই। তারা তো জলের মানুষ, বিপদ তাদের নিত্যসঙ্গী। বিপদ দেখতে দেখতে আর সইতে সইতে তারা অভ্যস্ত। বিপদ তাদের কাছে মামুলি ব্যাপার। তা ছাড়া তারা তো জানে সমুদ্রে দুই বেলা জোয়ার-ভাটা হয়। এখন ভাটার টান। তারা জানে, বিকেলে জোয়ার এলে জাহাজটা আবার ভেসে উঠবে। জেনেও কথাটা তারা যাত্রীদের জানায় না। কেন জানাবে? তারা তো চায় যে কারণেই হোক যাত্রীদের মনোবল ভেঙে পড়ুক, জীবনটা তাদের হাতে সঁপে দিক। মাস্টারের হাতে-পায়ে ধরে বলুক, আপনি আমাদের মা-বাপ, আপনি আমাদের জীবন-মৃত্যু মালিক।

বিকেলে জোয়ার শুরু হলো। ফুলে-ফেঁপে উঠল সমুদ্র। মাস্টারের নির্দেশে গ্রিজাররা ইঞ্জিন চালু করল। যথারীতি আবার চলতে শুরু করল জাহাজ। যাত্রীদের ঘাড়ে চেপে বসা যমের কালো হাতটা সরে গেল। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভুলে হর্ষধ্বনি দিতে দিতে ছাদে ভিড় করল সবাই। কেউ তাদের বাধা দেয় না। বাবুর্চি দুটো করে টোস্ট আর এক মগ পানি খেতে দিল। সকালে চাল-ডালের যে খিচুড়ি দেওয়া হয়েছিল কত আগে হজম হয়ে গেছে। বিস্কুটে খিদা কিছুটা মিটল।

সন্ধ্যা নামলে ভাতের আশায় সবাই যখন স্টাফ কেবিনের দরজায় ঠেলাঠেলি শুরু করল, সেদিনের মতো মাইকটা আবার বেজে উঠল। কর্কশ কণ্ঠে হুকুম জারি হলো, 'যে যেখানে আছ জলদি নিচে নামো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছাদ খালি করো।'

দিনের শেষে গোয়ালমুখী গরুর পালের মতো আশাহত আদমেরা হেজমুখী হয়। ছাদটা খালি হতে বেশি সময় লাগে না। তখন সন্ধ্যার সেই বিষণ্ন আলো-অন্ধকারে হেজের গলিতে রশিদাকে প্রথম দেখতে পায় দীপঙ্কর। গায়ে কালো বোরকা, মুখটা উদোম। চেহারায় ভয় আর ক্লান্তির ছাপ সত্ত্বেও চোখ দুটিতে এমন এক দ্যুতি ঝলকে ওঠে, দীপঙ্করের মনে হয়, জীবনে কখনো সে এমন আশ্চর্য সুন্দর চোখ দেখেনি। যেন চোখ নয়, প্রকৃতির গোপন বিবর থেকে উত্থিত দুটি হীরকখণ্ড। অনেক রাত পর্যন্ত

মায়াবী চোখ দুটি তার চোখে ভাসে। চোখ দুটি ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভুলিয়ে দেয়, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ভুলিয়ে মনটাকে চাঙা করে তোলে।

পরদিন সকালে দ্যুতিময় চোখ দুটি একনজর দেখার জন্য দীপঙ্কর অস্থির হয়ে ওঠে। ছাদে উঠে রশিদাকে খোঁজে। পায় না। তার মন মানে না। অলিগলি খুঁজে যখন হেজের ছাদে দাঁড়াল, দেখল, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে রশিদা। এক ধাপ নেমে চোখ তুলে দীপঙ্করের দিকে তাকাল। দ্বিতীয় ধাপে পা রেখে আবার তাকাল। দীপঙ্করের বুকের ভেতরে কী যেন হয়। বুকটা একবার ধপ করে উঠল। ভয়ে নয়, আতঙ্কে নয়, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায়ও নয়, এক মধুর ভালো লাগায়। মেয়েটি ভেতরে চলে গেলে হেজে দাঁড়িয়ে সে ভালো লাগাটা উপভোগ করে। তার মনে হয়, চোখ দুটি যেন তাকে এক নম্বর হেজের দিকে টানছে। যেন একটা খরস্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে পরিত্রাণের চেষ্টা করে না, অদ্ভুত ভালো লাগায় নিজেকে সে ভাসিয়ে দেয় স্রোতে।

স্রোত তাকে এক নম্বর হেজে টেনে আনে। যাত্রীরা খাবার নিয়ে ব্যস্ত। ছোট্ট একটা পলিথিনের ঠোঙায় সকালের নাশতা হিসেবে জনপ্রতি এক ঠোঙা মুড়ি-চানাচুর দেওয়া হয়েছে। মুড়িগুলো ওদা, দাঁতের নিচে পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে। চানাচুরগুলোতে চিমসে গন্ধ, তেলাপোকায় যেন হেগে-মুতে রেখেছে। তবু খাচ্ছে সবাই। না খেয়ে উপায় কী? পেটকে তো কিছু না কিছু দিতে হবে। কাশু বুড়োর মরার জায়গাটা ফাঁকা। ধোয়ামোছা হয়েছে, তবু জায়গাটার প্রতি সবার ভয়। সেখানে যেন যম যেন ওঁৎ পেতে আছে। কেউ বসতে বা শুতে গেলেই যেন গলা চেপে ধরবে। দীপঙ্কর তো জানে না জায়গাটাতেই মরেছিল বুড়ো, এখানেই তার মুখ থেকে রক্তধারা গড়িয়ে পড়েছিল। ফাঁকা পেয়ে সে বসে পড়ল। মায়াবী চোখ দুটি দেখার অপেক্ষায় চুপচাপ বসে থাকে। চোখ দুটির শরণ নিয়ে সে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে একটু ভালো লাগা খুঁজছে, এই দুঃসহ পরিস্থিতিকে একটু সহনীয় করার চেষ্টা করছে। নদী ও নারীর সান্নিধ্যে পুরুষের মন ভালো হয়। রশিদার চোখ দুটি তার চোখে এমনভাবে সেঁটে আছে, তার মনে হচ্ছে, এমন সুন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে সব কষ্ট সয়ে যেতে পারবে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভুলে থাকতে পারবে, সামনে মৃত্যু এসে দাঁড়ালেও হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারবে।

কিন্তু রশিদাকে সে আর দেখতে পায় না। চটের পর্দাটা সরিয়ে মায়াবী চোখ দুটি আবার দেখতে খুব ইচ্ছে করে। সাহস পায় না। পাছে কেউ কিছু মনে করে! কেউ যদি কৈফিয়ত তলব করে, কী চাও? এখানে তোমার কে আছে? পর্দা কেন সরালে? তখন কী উত্তর দেবে। রশিদাও টের পায়নি তাকে একনজর দেখার জন্য যে অচেনা এক যুবক পর্দার আড়ালে অপেক্ষা করছে, সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে যার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মালয়েশিয়াপ্রবাসী স্বামীর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। টের পেলে পর্দাটা সরিয়ে একবার হলেও উঁকি দিত। টের সে কিছুই পাচ্ছে না। যাত্রীদের কথাবার্তা, ইঞ্জিনের শব্দ, ছেলেপিলেদের হৈচৈ, কোনো কিছুই তার কানে ঢুকছে না। শোনার জন্য যে চেতনার দরকার তা লোপ পেয়েছে তার। দুই হাঁটু ভাঁজ করে তার ওপর মাথা রেখে সে চুপচাপ বসে আছে। মুড়ি-চানাচুরের ঠোঙাটা পড়ে আছে কোলের ওপর। খেতে ইচ্ছে করছে না। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা, অথচ মুখে রুচি নেই। কী হবে খেয়ে? না খেলেই বা কী হবে? তার কাছে এখন জীবন-মৃত্যু সমান। শুয়ে থাকতে থাকতে পিঠে ব্যথা ধরে গেছে বলে শুতে ইচ্ছে করছে না। বসে আছে তো আছেই। কারো সঙ্গে কথা বলে না, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দেয় না। নারী যাত্রীদের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে বেশি চঞ্চল, মুখরা। কথার পিঠে কথা বলত, সারাক্ষণ হাসি-ঠাট্টায় মেতে থাকত। টানা বারো দিন ধরে সে এই জাহাজে। খানাপিনায় কষ্ট করেছে, তবু মুখটা কোনোদিন ম্লান হয়নি। হঠাৎ কেন সে এমনভাবে নিভে গেল, কেউ কিছু বুঝতে পারে না। বুঝতে সে কাউকে দেয় না। সেদিন রাতে বিধ্বস্ত শরীরটাকে টানতে টানতে হেজে ফিরে সেই যে শুয়েছে আর উঠতে পারেনি। কী করে পারবে? শরীরের সব হাড়গোড় তো চুরমার হয়ে গেছে, মনটা তো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। শুয়ে শুয়ে সে কেঁদেছে। কেউ একটিবার জিজ্ঞেস করেনি কেন কাঁদছে। জিজ্ঞেস করার কী আছে? কান্নার কারণ তো সবার জানা। এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে কান্নার কারণ তো জিজ্ঞেস করা লাগে না। সবাই তো কাঁদছে, কান্নাই তো এখন একমাত্র সান্ত্বনা। কাঁদলে বুকটা হালকা হয়। তার কান্নাও হয়ত একই কারণে। তার কান্নার কারণ যে আলাদা, কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। কেউ ঘুণাক্ষরেও

> মৃত্যুর নিষ্ঠুর এই থাবা চলতে থাকে টানা চার দিন। কখনো সকালে, কখনো বিকেলে, কখনো মধ্যরাতে। কখনো একজন, কখনো দুজন, কখনো একসঙ্গে তিনজন থাবার শিকার হতে থাকে। জীবিতরা লাশগুলোকে সমুদ্রে ফেলে দেয়। এতটুকু শোক করে না। চোখে এতটুকু অশ্রু আসে না। একটা লাশ ফেলে হাত-পা গুটিয়ে অপেক্ষায় থাকে কখন তার ডাক পড়বে। কখন তার লাশটি তুলে দেওয়া হবে আদিমাতার কোলে। চতুর্থ দিন কৌতূহলী কমল গুনে দেখল আড়াই শ যাত্রীর মধ্যে আছে মাত্র এক শ সাতাশজন। তার বুক ফেটে কান্না এলো। কল্পচোখে লাবনীর মুখটা ভেসে উঠলে দ্বিগুণ বেগে উথলে ওঠে কান্না। বাবা-মায়ের মুখ মনে পড়ল। বন্ধুদের মুখগুলো মনে পড়ল

আন্দাজ করতে পারেনি কী তীব্র ঝড় বয়ে চলেছে তার বুকে, কী তীব্র স্রোত বয়ে চলেছে তার চোখে।

সারাদিন মনের সঙ্গে লড়াই করে রাতের ঘটনাটা মন থেকে সে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। মুছতে কিছুটা পেরেছিল, আগের মতো আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল। রাত প্রায় আটটার দিকে পেশাবের বেগ পেল খুব। উপরে ওঠার সাহস পায় না, বেগ উপেক্ষা করে ঝিম মেরে বসে থাকে। কিন্তু কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়? বাধ্য হয়ে দুই মহিলার সঙ্গে সে ছাদে ওঠে। একজন তার সমবয়সী, অন্যজন মধ্যবয়সী।

আন্নির টয়লেট থেকে বেরিয়ে রশিদা দেখল, বাইরে অপেক্ষমাণ দুই মহিলাকে টানতে টানতে প্রহরীরা স্টাফ কেবিনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আতঙ্কে সে চিৎকার করে উঠল। কেউ শুনতে পায় না তার চিৎকার। হয়ত পায়। পেয়েও কেউ উদ্ধারে এগিয়ে আসে না। মেরে ফেললেও আসবে না। কে চায় ঘাতকের হাতে নিজের প্রাণটা তুলে দিতে? স্টোর রুমের সামনে দিয়ে সে দেয়ানি হলের খোপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জায়গাটা অন্ধকার, মাস্তুলের আলো পৌঁছে না সেখানে। অন্ধকারে এক প্রহরীকে এগিয়ে আসতে দেখে সে খোপের সঙ্গে আরো সেঁটে দাঁড়ায়। লাভ হয় না। খপ করে তার কব্জিটা ধরে টানতে শুরু করল প্রহরী। নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টায় সে লোকটার হাত কামড়ে ধরল। লোকটার দেহমনে তো তখন কামনার তুফান, কামড়ে তার কী যায়-আসে। মাংস খুবলে নিলেও সে ব্যথা পাবে না।

উপায় না দেখে রশিদা বসে পড়ল। পেছন থেকে তখন তার পিঠে পড়ল প্রচণ্ড একটা লাথি। লাঠির বাড়িও পড়ল একটা। তবু সে নড়ল না। টেনে-হিঁচড়ে তাকে স্টাফ কেবিনের দিকে নিয়ে যেতে লাগল প্রহরী। তার হাঁটু আর কনুইয়ের চামড়া ছিড়ে গেল। ব্যথায় সে কঁকিয়ে উঠল। বাঁচার কোনো উপায় না দেখে সে মিনতি করল, 'আঁরে ছাড়ি দন না ভাইজান। আঁই আর ন পাইজ্জুম।'

প্রহরী তাকে ধমকায়, 'চুপ! একদম চুপ মাগি!'

রশিদা চুপ করে, আগের রাতে যেভাবে চুপ করেছিল। স্টাফ কেবিনে দুই মহিলার গোঙানি শুনতে শুনতে সিঁড়ি বেয়ে সে দোতলায় ওঠে। পাইলট রুমের খাটে যেভাবে শুতে বলে ঠিক সেভাবে শুয়ে পড়ে। একটুও নড়ে না, মুখে একটা শব্দও উচ্চারণ করে না, শুধু কান দুটো পেতে রেখে দানবীয় চিৎকার শোনে।

গভীর রাতে হেজে ফিরে চুপচাপ শুয়ে পড়ে। গত রাতের মতো আর কাঁদে না, রাতভর পড়ে পড়ে কেবল ঘুমায়। পেশাবের বেগ না পেলে সকালেও শোয়া থেকে উঠত না, শুয়ে শুয়েই দিনটা পার করে দিত। বুকে এখন আর কোনো শোক নেই। পাথরের কি আর শোক-তাপ থাকে?

বসে থাকতে থাকতে দীপঙ্করের ক্লান্তি আসে। মায়াবী চোখ দুটি দেখার আশা ছেড়ে দিয়ে সে তার জায়গায় ফিরে যায়। অচেনা মানুষদের সঙ্গে কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়। জুলফিকার, ওসমান ও তালেব ছাড়াও দুই নম্বর হেজের অনেকের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হয়েছে, তাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময়টা টেনেটুনে পার করে দেওয়া যায়। কমল তো আছেই। সে তো সারাক্ষণ আড্ডার মধ্যেই থাকে। একেকজনের কাছে গিয়ে বসে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে খাতির জমায়। বাড়ি কোথায়, মালয়েশিয়া কেন যাচ্ছে, বৈধপথে না গিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চোরাইপথে কেন যাচ্ছে, মালয়েশিয়ায় গিয়ে কী করবে, আগে থেকে চাকরি ঠিক করা আছে কি না, থাকলে কী চাকরি, বেতন কত...খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করে। তার কথার জাদুজালে তারা আটকা পড়ে। উত্তর না দিয়ে পারে না। সে মন দিয়ে শোনে আর মাঝে মধ্যে শোনা কথাগুলো ডায়েরিতে টুকে রাখে। আগের চেয়ে সে কিছুটা প্রফুল্ল। যেন সময়কে উপভোগ করছে, সময়ের কাছ থেকে শিক্ষা নিচ্ছে।

তখন দুপুর প্রায় সাড়ে এগারোটা। হেজের এক কোণায় বসে কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে কমল। তালেব আগের মতোই শুয়ে। খাওয়া আর পায়খানা-পেশাবের সময়টুকু ছাড়া শোয়ার জায়গাটুকু থেকে সে নড়ে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাছিমের মতো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে। বসে থাকতে থাকতে কোমরে ব্যথা ধরে গেলে শুয়ে পড়ে। একবার শুলে আর ওঠার খবর থাকে না। শরীর বলে ওঠো, মন বলে বসে থাকো। দু-দুটি হত্যাকাণ্ড তাকে একেবারে মুষড়ে দিয়েছে। হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকা মাথা থেকে কিছুতেই সরাতে পারছে না। ওসমান তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। দুজন বসে বসে কথা বলে। নিজেদের অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতের কথা। ওসমানের এখনো বুকভরা স্বপ্ন, দু-চোখে এখনো স্বপ্নের দোলাচল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, যত যাই ঘটুক, একদিন মালয়েশিয়া সে পৌঁছবেই। তার এত স্বপ্ন বৃথা যেতে পারে না। সাময়িক কষ্টের মধ্যে আছে এখন। মালয়েশিয়া পৌঁছে চাকরিবাকরি করে টাকাপয়সা হাতে এলে এই কষ্টের কথা আর মনেই থাকবে না। এখন একমাত্র কাজ দাঁতে দাঁত চেপে সব সয়ে যাওয়া।

তালেবের বিশ্বাসে ভাঙন ধরে গেছে। তার মন বলছে গন্তব্যে পৌঁছার আগেই তার মৃত্যু হবে, কাণ্ড বুড়োর মতো প্রহরীরা তার পেটটাও চিরে লাশটা সাগরে ফেলে দেবে। সামান্য হলেও খাবার এখনো দিচ্ছে, দুদিন পর দেবে কিনা ঠিক নেই। তা ছাড়া শোনা যাচ্ছে জাহাজটা নাকি থাইল্যান্ড যাবে। বেশ কিছুদিন থাকতে হবে সেখানে। সেই কিছুদিন আসলে কতদিন কেউ জানে না। এক সপ্তাহ হতে পারে, দুই সপ্তাহও হতে পারে, এক মাসও হতে পারে। এতগুলো মানুষকে এত দিন কে খাওয়াবে? এত খাবার কে দেবে? তার আশঙ্কা, শেষ পর্যন্ত সবাইকে না খেয়েই মরতে হবে। আশঙ্কাটা এত প্রবলভাবে তার মাথায় ভর করেছে, তেল ফুরিয়ে যাওয়া কুপির মতো সে একটু একটু করে নিভে যাচ্ছে। ওসমান তাকে অভয় দেয়, মানুষ কি এর আগে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া যায়নি? তারা কি না খেয়ে মরে গেছে? ব্যবস্থা কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই। এতগুলো মানুষ না খেয়ে মরবে তা কি হয়?

তালেবের মাথায় কিছু ধরে না। কী ঘটছে, কী ঘটবে কিছুই ভাবতে পারে না। কেবলই মনে হয়, এক চক্র থেকে বেরিয়ে যেন আরেক চক্রে ঢুকে পড়েছে। মৃত্যুর বিভীষিকা চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরেছে। ক্ষুধা ও মৃত্যুচিন্তায় কলেরা রোগীর মতো চেহারাটা একেবারে ধসে গেছে। যতক্ষণ ওসমানের সঙ্গে কথা বলে ততক্ষণ ভালো থাকে, কথা বন্ধ করলে দুশ্চিন্তার মণ মণ ওজনের ভোঝাটা মাথায় চড়ে বসে, মৃত্যুচিন্তা প্রবল হয়ে ওঠে। হেজের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় অস্থির পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে জুলফিকার। হাঁটা আর কথা বলার ধরন দেখে বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না তার মাথায় যে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। সকালে মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে আসার পর থেকেই সে অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে। মুড়ি-চানাচুর খেয়ে হাতমুখ ধুতে কলঘরে গিয়েছিল। বের হওয়ার সময় কেবিনের সিঁড়ির কাছে মাস্টারের দেখা পেয়ে হাত দুটো চেপে ধরে বলে, 'আপনি হামার ধর্মের ভাই, আপনের দুডে পাওত পড়ি। হামাক আবার দ্যাশোত ফিরে পাঠাবার বুদ্ধি করেন। মালেশিয়া যাবার হাউস হামার মিটে গ্যাচে। দয়া করেন ভাই।'

মাস্টারের বুঝি সত্যি সত্যি দয়া হয়। হাতের ইশারায় তার সঙ্গে কেবিনের দোতলায় উঠতে বলে। নিজের রুমে নিয়ে মাস্টার তাকে বলে যে, জুলফিকারকে দেশে ফেরত পাঠাতে তার কোনো আপত্তি নেই। যাত্রীদের থাই উপকূলে পৌঁছে দিয়ে জাহাজটি আবার বাংলাদেশে ফেরত যাবে। জুলফিকার যদি লাখ দুয়েক টাকা দিতে পারে তবে তাকে আবার ফেরত এনে ঠিকঠাকমতো বাড়ি পৌঁছে দেবে।

দুই লাখ টাকা! জুলফিকার খিক্ করে হেসে দেয়। মাস্টার বুঝি তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। হাসতে হাসতে বলে, 'ঠাট্টা করিচ্চেন ভাইজান?'

মুহূর্তে মাস্টারের চেহারাটা বদলে যায়, 'ঠাট্টা করব কেন? আমি আপনের শালা না দুলোভাই?'

জুলফিকারের হাসি উবে যায়, অপরাধীর মতো মাথা নুইয়ে সে দাড়িতে হাত বুলায়। মাস্টার তাকে ধমকায়, 'কথা কচ্ছেন না ক্যা?' জুলফিকার কথা কিছু বলতে পারে না। খানিকক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে আড়চোখে একবার মাস্টারের রাগান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে কপাল ঘষতে ঘষতে রুম থেকে বেরিয়ে যায়। হেজে নেমে নিজের জায়গায় চুপচাপ বসে থাকে। চোখের দৃষ্টি ঘোলা, ঠিক বোঝা যায় না কোন দিকে তাকিয়ে। চেহারা দেখে বোঝা যায় গভীর কোনো চিন্তায় মগ্ন। কমল তার কাছে বসে কুশলাদি জানতে চায়, সে ফিরেও তাকায় না। কমল বলে, 'কোনো সমস্যা হুজুর?' সে জবাব দেয় না। পিঠ চাপড়ে কমল সান্ত্বনা দেয়, 'যা হওয়ার হবে, এত চিন্তা করে লাভ নাই। আসেন আমরা গল্প করি।'

জুলফিকার এবার সে ঘাড়টা ঘোরায়। দৃষ্টিন্তে উদভ্রান্তি। চড়া গলায় বলে, 'আপনার মন কেংকা আচে? আপনি ম্যালা সুকে আচেন? সুকোত থাকলে সরেন এটি থাকে। ইয়ার্কি মারার টাইম নাই হামার।'

মেজাজ বুঝে কমল সরে বসে। সেই শুরু জুলফিকারের বকাবকি। প্রথমে মনসুর ওরফে জামাইর উদ্দেশে গালাগাল করে কিছুক্ষণ। হায়দর আলীকেও বাদ দেয় না। তার জানা যত অভিশাপ আছে সব দেয় দুজনকে। তালেব তার সঙ্গে তাল মেলায়। কীভাবে হায়দরের মতো একটা প্রতারকের পাল্লায় পড়ল সেই কাহিনি ওসমানকে শোনায়। যাত্রীরা কান খাড়া করে প্রতারণার কাহিনিটা শোনে। শুনতে শুনতে তাদের উদ্বেগ বাড়ে, ভবিষ্যতের চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে।

দুপুর পর্যন্ত একটানা বকে যায় জুলফিকার। খাবারের ডাক পড়লে পড়িমরি করে সবার আগে গিয়ে দাঁড়ায়। স্টাফ কেবিনে যে তার আগে যাওয়ার চেষ্টা করল ধমকে তাকে পিছে হটিয়ে দিল, 'সর সর, সর বান্দুত। চিনস তুই হামাক? হামার নাম মাওলানা মো. জুলফিকার আলী। মুজাহিদে আফগান। চিনস হারামজাদা? বাপের নাম আক্কাস আলী। চিনস বেটা?'

বাবুর্চির হাত থেকে খাবারের ঠোঙাটা নিয়ে একদৃষ্টে ভাতগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে জুলফিকার। আধা সেদ্ধ কিছু ভাত, সঙ্গে দুটো পোড়া মরিচ আর একটা সেদ্ধ আলু। বাবুর্চি তাকে সরতে বলে, সে কানে তোলে না। ভাতের ঠোঙা থেকে চোখ সরায় না। যেন এমন কিছু দেখছে, জীবনে যা কোনোদিন দেখেনি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হাসতে শুরু করল। সে কি হাসি! পেটে যেন আনন্দের গোটা পড়েছে। হাসির জন্য ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে পারে না। বাবুর্চি তাকে ধমকায়, 'পাগলের মতন এমন করে হাসতেছ কেন মিয়া?' বাবুর্চির ধমকে হাসি আরো উথলে উঠল। হাসতে হাসতে এবার সে বসে পড়ল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, 'আচ্ছা, হামি হাসছি কেন?' বলে আবার হাসতে শুরু করল। তার হাসি দেখে অন্যদেরও হাসি পায়। যত কষ্টেই থাকুক, অকারণে কাউকে এভাবে হাসতে দেখলে না হেসে কি পারা যায়। হাস্যরোলের মধ্যে বাবুর্চি তার চেহারার কাঠিন্যটা ধরে রাখতে পারে না, সেও হে হে করে হাসা ধরে। হাসির গমকে তার বপুটা লাফায়। জুলফিকারের হাসির ধরন কমলের অস্বাভাবিক ঠেকে। সে স্বগতোক্তি করে, 'সামথিং রং! লোকটা বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছে।'

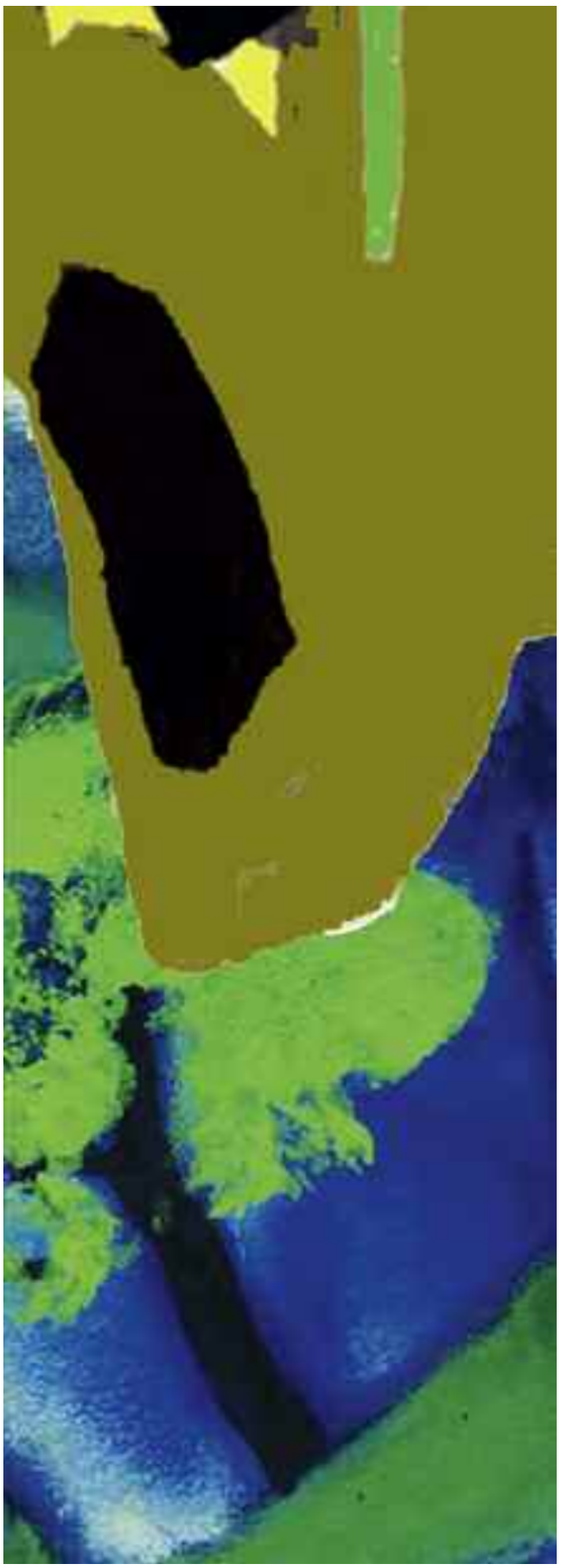

খাওয়া শেষে হেজে নেমে আবার আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল জুলফিকার। কথার খেই হারিয়ে ফেলছে, একটা বলতে গিয়ে আরেকটা বলে ফেলছে। এক মুহূর্ত কোথাও স্থির হয়ে বসছে না, হেজের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় হাঁটে আর বকে। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওসমান। জানতে চাইল, 'হুজুর, কী হইছে আপনার?

জুলফিকার উত্তর দেয় না।

বাহু দুটো ধরে ঝাঁকি দিয়ে ওসমান বলল, 'কী হইছে হুজুর? এমন করতেছেন কেন?'

দুই হাতের বুড়ো আঙুল দুটো খাড়া করে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ক্ষিপ্তকণ্ঠে জুলফিকার উত্তর দিল, 'বাল হচে বাল। সর বেটা, আগে থাকে সর।'

ওসমান সরে দাঁড়ায়। ভয়ও পায় খানিকটা। ভাবে, জুলফিকারের ওপর সাগরের দৈত্য-দানো ভর করল না তো! যে কারণেই হোক, লোকটার মাথা যে গেছে, তার আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু মাথা তো তার খারাপ ছিল না। গত কদিনে তার সঙ্গে কত গল্প-গুজব কত হাসি-ঠাট্টা করেছে। কই, একবারও তো মনে হয়নি মাথায় গণ্ডগোল আছে। কমল জানতে চাইল, 'আগে কখনো এমন হয়েছিল হুজুর?' জুলফিকার জবাব দেয় না। এক যাত্রী বলল, 'মনে হয় আগেই ডিপিট ছিল। শীত গেল কদিন হলো। শীতে পাগল চেতে জানেন না?'

সন্ধ্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরল জুলফিকার। চেহারার উদভ্রান্তিটা কেটে গেল। যাত্রীরা তার অবস্থা জানতে চাইলে মাথা নাড়িয়ে সাঁয় দেয়। সারা দিন যেসব পাগলামি করেছে তার কিছুই মনে করতে পারে না। কলঘর থেকে অজু করে মাগরিবের নামাজ পড়ে। নামাজ শেষে মোনাজাত ধরে দীর্ঘ সময় কাঁদে। খোদার কাছে তার একটাই আর্জি, এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্তি। কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'লোভত পরে হামি পাপ করিচি মাবুদ। তুমি হামাক একন পাপের সাজা দিচ্চো। তোমার রহমের ভাণ্ডারত থাকে অল্পিএনা রহম হামাক দ্যাও। যিংকা করেই হোক হামি দ্যাশোত ফিরবের চাই। দ্যাশোত ফিরে দরকার হলে মাটি কাটমো, ইস্কা চালামো, গারিস্তোর কামলা খাটমো, দরকার হলে না খায়ে মরমো, তাও বিদ্যাশের নাম কুনুদিন মুকোত আনমোনা। হামার গুনোখাতা মাপ কোরে দ্যাও আল্লা। হামাক তোমার কুদরতের হাত দিয়ে বাঁচাও আল্লা।'

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত যাত্রীদের মন তো এমনিতেই ভিজে আছে, জুলফিকারের রোনাজারি দেখে মনটা আরো ভিজে যায়। মন ভিজলে তো চোখও ভেজে। অশ্রু কেউ ধরে রাখতে পারে না। আল্লাহর দরবারে হাত তুলে তারাও মুক্তির আর্তি জানায়। তালেবও বাদ যায় না। ওসমান সেজদার ভঙ্গিতে বসে কাঁদে। দেখতে দেখতে সমস্ত হেজে কান্নার রোল পড়ে যায়। কান্নার প্রতিযোগিতা শুরু হয় যেন। যে যত বেশি কাঁদবে তত তাড়াতাড়িই যেন সে মুক্তি পাবে। কেউ চাপাস্বরে, কেউ উচ্চৈস্বরে, কেউ বা চিৎকার করে কাঁদে। যারা কাঁদতে পারে না, খোদার কাছে যাদের চাওয়ার কিছু নেই, তারা চুপচাপ বসে থাকে। যেমন দীপঙ্কর। এত কান্নাকাটি অসহ্য লাগছে তার। কমল নিঃশব্দে ছাদে উঠে যায়। অন্ধকারে আন্নির একটা মোটে বসে রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করে। চাঁদ নেই। হাজার হাজার নক্ষত্র সেঁটে আছে আকাশের গায়ে। উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল, যুগল আর পুঞ্জ। চাঁদকে সম্ভাষণ জানাবার জন্য সমস্ত আকাশ আলোকমালায় নিজেকে সাজিয়ে নিয়েছে।

রাত বাড়ে। দশ দিগন্ত উজালা করে আকাশে চাঁদ ওঠে। আলোর প্রতিফলনে আশ্চর্য সুন্দর দেখায় সমুদ্রকে। কমল নামে না। চাঁদটা তাকে নামতে দেয় না। এই আদিম আলোকখণ্ডটির দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত কষ্ট ধুয়েমুছে যাচ্ছে। তার দ্বিতীয় সত্তা তাকে বলে, অপহৃত হয়েছ বলে তুমি কিনা দুশ্চিন্তায় ভুগছ কমল! অপহৃত না হলে কোনোদিন প্রকৃতির এই আশ্চর্য সুন্দর রূপের দেখা কি পেতে? তুমিই তো বল প্রকৃতির সন্তান তুমি। পৃথিবীর প্রতিটি দেশই তোমার। উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু সবই তোমার। অথচ এখন তোমার মন কিনা দেশের জন্য কাঁদছে! মুছে ফেল, মন থেকে সব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা মুছে ফেল। রবীন্দ্রনাথের গান শোনোনি? তবে অচেনাকে কীসের ভয়? ভয় না করে বরণ করে নাও বরং। জাহাজটা যেদিকে যায় যাক। যেতে দাও। প্রকৃতির যে সৌন্দর্যে এখন বুঁদ হয়ে আছ, নিশ্চিত করে তো বলতে পার না এর চেয়ে অধিক সুন্দর কিছু তোমার জন্য অপেক্ষা করছে না।

গুনগুন করে গান ধরে কমল, 'অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে...।'

হঠাৎ হাঁক শোনা গেল, 'কে ওখানে?'

কজিকাটা মাসুক, যাকে দেখলে যাত্রীদের কলিজার জল শুকিয়ে যায়, সিঁড়ি বেয়ে উঠে কমলের সামনে দাঁড়াল। তাকে চিনতে কমলের অসুবিধা হলো না। মাসুককে ভয় সেও পেত, দুপুরে ভয়টা কেটে গেছে। দুপুরে ভাত খেয়ে সে ঘুমানোর চেষ্টা করছিল। জেগে জেগে দুশ্চিন্তা করার চেয়ে বরং ঘুমানো উত্তম। কিছুটা সময় মাথার ওপর দুশ্চিন্তার চাপটা অন্তত থাকবে না। কিন্তু এমন দুঃসহ পরিস্থিতিতে চাইলেই কি ঘুমানো যায়? চাইলে কি মাথা থেকে দুশ্চিন্তার ভোঝাটা নামিয়ে রাখা যায়? তার ওপর জুলফিকারের বকবকানি আর যাত্রীদের হট্টগোল। পেটে ভাত নেই, খিদায় তারা কাতর, তবু একেকটার গলার আওয়াজ যেন রাজহাঁসের ডাক। সারাক্ষণ প্যাঁক প্যাঁক করছে তো করছেই। আর ফুরোয় না। কত যে কথা। অতীতের, বর্তমানের, ভবিষ্যতের। কথার ফাঁকে ফাঁকে আবার ঝগড়াঝাটিও করে। কে কোথায় থুতু ফেলেছে, কার বগলে পচা চুঁছোর গন্ধ, কার গায়ে গুয়ের গন্ধ, কে কার মুখের ওপর পাদ দিয়েছে, রাতের বেলায় কে কার পাছা উদোম করে শিশ্নের গুতো দিয়েছে, কে কার জায়গা দখল করে অণ্ডকোষ ঝুলিয়ে বসে আছে...এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়াঝাটি।

কমলের কানে কিছু ঢুকছিল না। ব্যাগটা সিথানে দিয়ে সে চোখ বুজে শুয়ে ছিল। শুয়ে শুয়ে জাহাজিদের কথা ভাবছিল। যাত্রীরা তো এখন আর ভয়ে তাদের সঙ্গে কথাটথা কিছু বলে না। মাস্টার তো বটেই, সুকানি-গ্রিজার-প্রহরী এমনকি বাবুর্চিও নিজেদের চারদিকে ভয়ের এমন একটা দেয়াল খাড়া করে রেখেছে, যেটি ভাঙার সাহস কেউ পায় না। কমল ভাবে, আচ্ছা, দেয়ালটা কি ভাঙা যায় না? যতই নিষ্ঠুর হোক, তারা তো মানুষ। বনের হিংস্র পশুকেও তো মানুষ বশে আনতে পারে, মানুষকে না পারার তো কোনো কারণ নেই। তাদের সঙ্গে খাতির জমানো যায় কি না একবার তো চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

শোয়া থেকে উঠে ব্যাগটা পিঠে চড়িয়ে সে ছাদে ওঠে। বিস্তীর্ণ আকাশ আর অতলান্ত সমুদ্র ছাড়া কোথাও কিছু দেখা যায় না, দমকা বাতাস আর অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের অবিরাম শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। স্টাফ কেবিনে প্লাস্টিকের টেবিলটায় এক গ্রিজারের সঙ্গে দাবা খেলছে কজিকাটা মাসুক। বাকিরা নিজ নিজ কামরায় ভাতঘুমে। কলঘর থেকে হাতমুখ ধুয়ে ধীর পায়ে কমল টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়ায়। টেবিলের চারদিকে বহু ব্যবহারে জীর্ণ চারটি প্লাস্টিকের চেয়ার। দুটি তাদের দখলে, বাকি দুটি ফাঁকা। মাথা তুলে তারা কমলের দিকে তাকায়। কজিকাটা মাসুক চোখের ইশারায় জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'না ভাই, এমনি। খেলা দেখতে এলাম।'

'দেখার কিছু নাই, ভাগো।'

কমল নড়ে না। বুকের ওপর হাত দুটো মুড়ে চুপচাপ খেলা দেখে। প্রহরীও আর কিছু বলে না। খানিক পর সাহস করে খালি চেয়ার দুটির একটিতে টুপ করে বসে পড়ল কমল। কড়া চোখে একবার তার দিকে তাকিয়ে আবার খেলায় মনোযোগ দেয় কজিকাটা মাসুক। মনটা দাবার বোর্ডে সেঁটে রেখে ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'বাড়ি কডে?'

যতটা সম্ভব কোমল স্বরে কমল বলে, 'ঢাকা।'

'বাহ! এক্কোওয়ারে রাজধানীর মানুষ!'

মুচকি হেসে কমল মাথা নাড়ায়। মুখটা তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'করো কী?'

'তেমন কিছু না।'

'বেকার?'

'বেকার কি আর থাকা যায়। পৃথিবীটা কর্মক্ষেত্র, কর্ম না করে কে বাঁচতে পারে ভাই।'

ব্যস, শুরু হয়ে গেল কথার আসর। ভাঙা শুরু হলো দেয়াল। কমল তো কথায় ওস্তাদ, তার কথা না শুনে কি তাদের উপায় আছে? কথার জাদুতে ধীরে ধীরে সে ভয়ের দেয়ালটা ভাঙতে থাকে। একটা একটা করে ইট সরায় আর তাদের অন্তর্লোকের দিকে পা পা করে আগায়। তার কথায় মজতে থাকে দুই জাহাজি। কমল ঢাকা শহরের কথা বলে, মতিঝিল-গুলশান-বনানীর বহুতল ভবনের কথা বলে, সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের কথা বলে, রাজনীতিবিদ আর কবি-সাহিত্যিকদের কথা বলে। খেলার কথা ভুলে সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে শোনে। তার জাদুকরি কথা শুনতে বাবুর্চিও আসরে যোগ দেয়। বাবুর্চির চেহারাটা এখন শান্ত, হাস্যোজ্জ্বল। পান চিবুচ্ছে, মুখ থেকে নেশাধরা জর্দার গন্ধ বেরোচ্ছে। কমল তাকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা চাচা, জাহাজে আপনি কতদিন ধরে আছেন?'

বাবুর্চি উঠে ফোটবাড়ির ফোকর দিয়ে পানের পিক ফেলে। ফিরে এসে পায়ের ওপর পা তুলে বসে কপাল ঘষতে ঘষতে বলে, 'কত আর, এই ধরো সতেরো-আঠারো বছর। একানব্বই সালে গরকি হলো না দেশে? সেই বছর ঘরবাড়ি সব রাক্ষুসী মেঘনা গিলে খাইল। বাপ-দাদার ভিটামাটি হারাইয়া বউ-বাচ্চা নিয়া পথে নামতে হইল। মেলা কষ্ট করেছি জীবনে। কত যে ছিদ্দত বলে শেষ করা যাবে না। ভাসতে ভাসতে একটা সময় চলে গেলাম নিঝুম দ্বীপ। খুঁটাটা দিলাম গেড়ে। দুই বছর বাদে এই জাহাজে চাকরি নিলাম। হিসাব করো এবার কত বছর হয়।'

কমল বলে, 'নিঝুম দ্বীপে আপনার বাড়ি? শুনেছি খুব সুন্দর জায়গা। হরিণের অভয়ারণ্য। যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। সময় করে উঠতে পারিনি। বেঁচে থাকলে যাব একদিন। আচ্ছা চাচা, আপনার নামটা কি জানতে পারি?'

কমল ব্যাগ থেকে ডায়েরিটা বের করে কোলের ওপর রাখে। ডায়েরিটা দেখে, নাকি নাম জিজ্ঞেস করায় কে জানে, খানিকটা ঘাবড়ে যায় বাবুর্চি। বড় চোখ দুটি আরো বড় করে বলে, 'নাম দিয়া কাম কী মিয়া? সম্বাদিক নাকি?'

কমল বলে, 'সেই কপাল কি আমার আছে চাচা? সাংবাদিকতা অনেক বড় পেশা। আমি এমনি জানতে চাইছি। জ্ঞানের তো শেষ নাই। এই যে সমুদ্রটা দেখছেন, জ্ঞান ঠিক এই সমুদ্রের মতো। কূল-কিনারা নাই। জাহাজ হচ্ছে পৃথিবীর আদিম বাহন। বিমান ট্রেন বা বাস আবিষ্কারের আগে দূরদূরান্তে যাতায়াতের একমাত্র বাহন ছিল জাহাজ। অথচ দেখেন জাহাজ সম্পর্কে এত দিন তেমন কিছুই জানতাম না। আপনার কাছ থেকে শুনে ডায়েরিতে লিখে রাখব ভাবছি। ভবিষ্যতে কাজে লাগতেও তো পারে।'

বাবুর্চির চোখ দুটি ছোট হয়ে আসে। ফিক করে হেসে দিয়ে বলে, 'আসগর। আমার নাম আসগর আলী।' নামটা কমল টুকে রাখল ডায়েরিতে। কজিকাটা মাসুকের চেহারার কাঠিন্য ধীরে ধীরে মুছে যাওয়া ধরে। হয়ত তার ভেতরে এক ধরনের অপরাধবোধ জাগে। কমলের মুখের দিকে তাকিয়ে হয়ত সে ভাবছে, কমল নিশ্চয়ই লেখাপড়া জানা লোক। নইলে এত সুন্দর করে কথা বলতে পারত? লিখতে পারত? তার মতো একজন শিক্ষিত মানুষকে কিনা জোর করে আমরা মালয়েশিয়া পাচার করে দিচ্ছি! অথবা ভাবছে, কমল নিশ্চয়ই অনেক টাকাপয়সার মালিক। ঠিকমতো ধরলে মোটা অঙ্কের টাকা খসানো যাবে।

সেই উজালা চাঁদের আলোয় কমলকে চিনতে মাসুকের অসুবিধা হলো না। সে বলল, 'একা একা কী করেন?' বলে আর দাঁড়াল না, আবার নেমে গেল নিচে। রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত একাকী বসে থাকল কমল। তাকে খুঁজতে দীপঙ্কর যখন ছাদে উঠল সে তখন স্টাফ কেবিনের টয়লেটে। হেজের গলি ধরে হাঁটতে হাঁটতে দীপঙ্কর আন্নির ডেকে গিয়ে দাঁড়াল। কোথাও কেউ নেই। স্টাফ কেবিনে প্রহরীরা খেতে বসেছে। মাস্টারব্রিজের ফোকর দিয়ে সুকানির মাথাটা দেখতে পায় দীপঙ্কর। সুকানির দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করতে স্টোর রুমের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। চোখ আটকে গেল দূর দক্ষিণে, যেখানে আকাশ উজ্জ্বল, সমুদ্র যেখানে আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। আকাশ, সমুদ্র, তারকারাজি আর চাঁদ মিলেমিশে এমন এক দৃশ্য তৈরি করেছে, ভাষা দিয়ে যা প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। যেনবা এই দৃশ্য দেখার আগে তার চারদিকে দৃশ্যমান এই জগৎ শাস্ত্রপ্রোক্ত সেই গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা ছিল, যা ছিল জ্ঞানের অতীত, কোনো লক্ষণের সাহায্যে যাকে অনুমান করা যেত না। যেনবা খানিক আগে প্রলয় হয়েছে। প্রলয় শেষে সূক্ষ্মরূপধারী ভগবান স্বয়ম্ভু নিজে বীর্যশালী হয়ে আকাশ প্রভৃতি মহাভূতকে এই মাত্র প্রকাশ করে সৃষ্টিপূর্ব সেই তমসাচ্ছন্ন অবস্থার ধ্বংসকারীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। চাঁদ ও তারকারাজির সঙ্গে যে অগাধ জল মিশে আছে, তা যেন নর নামক সেই পরমাত্মার দেহ থেকে এইমাত্র সৃষ্টি হয়েছে।

কারো পদশব্দে দীপঙ্করের ঘোর কেটে যায়। চোখের সামনে থেকে মুছে যায় দৃশ্যটি। সে আবার দক্ষিণে তাকায়। না, দৃশ্যটি আর দেখতে পায় না। সে হাসে। নিজমনে বলে, হা হা, নাস্তিক হয়ে আমি কিন শাস্ত্রের অলীক ভাষণের কথা ভাবছি!

কয়েক পা সামনে এগিয়ে দাঁড়াল দীপঙ্কর। আধো অন্ধকারে দেখতে পায়,

দেয়ানি হলের খোপে হেলান দিয়ে কে যেন দাঁড়িয়ে। গায়ে বোরকা দেখে আন্দাজ করল নিশ্চয়ই রশিদা, যাকে একনজর দেখার জন্য সারা দিন আকুল হয়ে ছিল। চাঁদের আলোয় তাকে চিনতে ভুল হয় না তার। হয়ত তার উপস্থিতি টের পেয়ে রশিদা সরে দাঁড়ায়।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কেমন আছেন?'

রশিদা নিরুত্তর।

শুনতে পাচ্ছেন?

রশিদা ধীর পায়ে হেজের গলিতে গিয়ে দাঁড়াল। দেয়ানি হলের ওপর দু-হাত আর হাতের ওপর থুতনি রেখে চাঁদের দিকে তাকাল। মায়াবী চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় তাকে আরো মায়াবী দেখায়। তার প্রতি দুরন্ত একটা টান অনুভব করে দীপঙ্কর। একটিবার যদি তার পাশে দাঁড়ানো যেত। চাঁদের আলোয় একটিবার যদি তার মায়াবী মুখটা দেখা যেত। থুতনিতে আঙুল ঠেকিয়ে যদি বলা যেত, রশিদা, তোমার চোখ দুটি খুব সুন্দর। কিন্তু সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর সাহস পায় না সে। অজানা-অচেনা মেয়েমানুষ, অচেনা পুরুষ দেখে হঠাৎ যদি চিৎকার দেয়! যদি জাহাজিদের কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করে! বলা তো যায় না। তবু তার সঙ্গে কথা বলার জন্য গলাটা ভীষণ খচখচ করে। কথা তাকে বলতেই হবে। কয়েক পা এগিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আপনিও কি মালয়েশিয়া যাচ্ছেন?'

পিঠ টান করে রশিদা এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। দীপঙ্কর ভাবে, রশিদা এবার বুঝি তার দিকে ফিরে তাকাবে। উত্তেজনায় তার বুকটা ধপ ধপ করে। রশিদা দু-হাতে ভর দিয়ে দেয়ানি হলের ওপর উঠে দাঁড়াল। চাঁদের আলোয় ঝিলমিলে জলের দিকে তাকাল। দীপঙ্কর আঁতকে উঠল। এবার ডানামেলা পাখির মতো দু-হাত দুদিকে প্রসারিত করে দিল রশিদা। দীপঙ্কর কিছু বুঝে উঠবার আগেই সে লাফ দিল। একটা শব্দ হলো ঝুপ করে। খানিকের মধ্যেই শব্দটা মিলিয়ে গেল। দীপঙ্কর চিৎকার দিতে চেয়েও পারল না। অদৃশ্য একটা হাত তার গলা চেপে ধরে রাখল।

চার.

মার্চের নয় তারিখ বিকেলে থাইল্যান্ডের আন্তর্জাতিক জলসীমার প্রায় কুড়ি মাইল পশ্চিমে নোঙর ফেলল সাউথ বেঙ্গল-৩। রেইয়ং উপকূলে নোঙর করার কথা ছিল। পাজুবান অংকাচোতেফান সেই নির্দেশনাই দিয়েছিল। যে গতিতে চলছিল বারো দিনেই রেইয়ং উপকূলে পৌঁছে যেতে পারত। সেদিন দুপুরে মাস্টারের মোবাইলে পাজুবানের ফোন করে বলল, 'রেইয়ং নয়, জাহাজ ভেড়াতে হবে সাতুন উপকূলে।' তার নির্দেশমতো জাহাজ সাতুনের দিকেই নিয়ে যাচ্ছিল মাস্টার, কিন্তু বিকেলেই আবার পাজুবানের ফোন, 'মাঝসমুদ্রে কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হবে। পরবর্তী ফোন না দেওয়া পর্যন্ত নোঙর তোলা যাবে না।'

কী আর করে মাস্টার, নোঙর ফেলে পাজুবানের ফোনের অপেক্ষায় দিন গুনতে লাগল। এক দিন গেল, দুদিন গেল, চার দিনও কেটে গেল, অথচ তার ফোন এলো না। বিরক্ত মাস্টার পঞ্চম দিন ভোরে তার নম্বরে ফোন দিল। পাজুবান ফোন ধরে না। ডায়ালের পর ডায়াল করে, ধরে না তো ধরেই না। চিন্তায় পড়ে গেল মাস্টার। কোনো ঝামেলা হলো না তো! চোরাইপথে আদম পাচারে ঝামেলার তো শেষ নেই। বাংলাদেশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ডের পুলিশ সামলাও, কোস্টগার্ড সামলাও। হাজার হাজার টাকা ঢালো। সবাইকে দিয়ে-থুয়ে লাইন ক্লিয়ার করে তারপর জাহাজ ছাড়ো। নইলে যাত্রী-চালক সবার ঠিকানা কারাগার। সবই টাকার খেলা। টাকা নেই তো খেলা বন্ধ।

দুপুরে ফোন দিল পাজুবান। তার সেই একই কথা, 'আরো ক'টা দিন অপেক্ষা করতে হবে, আমি ফোন করে জানাব।' সেই ক'টা দিন আসলে কতদিন জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল মাস্টার। পাজুবান উত্তর না দিয়েই লাইনটা কেটে দিল। তার স্বভাবটা এমনই। কারো কথা শুনতে চায় না, কারো কথা মানতে চায় না। ভুল-শুদ্ধ যাই হোক, নিজে যা বলে দলের অন্যদের তা মানতে হবে। মাস্টারের মেজাজ তো সবসময় চড়াই থাকে, পাজুবানের কথা শুনে আরো গেল চড়ে। তাকে বান্দির পুত বলে দিতে ইচ্ছে করল। ঠোঁটের কাছে চলে আসা গালিটা জোর করে আবার পেটে চালান করে দিল। যত যাই হোক, এত অল্পে পাজুবানকে সে গালি দিতে পারে না। সে তার হুকুমের গোলাম, তার কথার বাইরে কোনোদিন যায়নি, যাবেও না। পা চাটতে বললে চাটবে, গু খেতে বললে খাবে। প্রাণটা তার হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া যা যা করতে বলবে সবই করবে। জাহাজে চাকরি করে সারা জীবন যা কামিয়েছে, পাজুবানের মাধ্যমে সমুদ্রপথে আদম পাচারের কারবার করে গত কয়েক বছরে তার দ্বিগুণ কামিয়েছে। তাকে অসম্মান করা যায় না। সামনে তো নয়ই, পেছনেও কোনোদিন তাকে নিয়ে খারাপ কোনো মন্তব্য করেনি।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। পাজুবানের খবর নেই। অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠল মাস্টার। এতগুলো মানুষ নিয়ে কতদিন অপেক্ষা করা যায়। খাবার ও পানির মজুদ প্রায় শেষের পথে। যা আছে টেনেটুনে দিন পনেরো হয়ত চালানো যাবে। তারপর আদমেরা বটেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জাহাজিদেরও মরতে হবে। সেদিন ফোন করে খাবার ও পানির কথা পাজুবানকে জানাল। পাজুবান বলল, 'কোনো রকমে চালিয়ে নাও। দরকার হলে নৌকায় করে খাবার আমি পাঠিয়ে দেব।' ফোন রেখে তার কথাটা ফু মেরে উড়িয়ে দিল মাস্টার। পাজুবান খাবার পাঠাবে, এ কথা তাকে বিশ্বাস করতে হবে! ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তার মতো এমন ডজন ডজন মাস্টার নাই হয়ে গেলেও তার মন এতটুকু টলবে না। শরীরটা তার রক্ত-মাংসের হলে কি হবে, বুকটা নিরেট পাথর।

পাজুবানের কথায় মাস্টারের মাথায় যে রাগটা চড়ে, তা সওয়ার হয় ইয়াসমিনের স্বামীর উপর। খানিক আগে সন্তান প্রসব করেছে ইয়াসমিন। সকালে প্রসব বেদনা ওঠে। তার শাশুড়ি, স্বামী আর দেবর মিলে একটা লুঙিতে বসিয়ে ধরাধরি করে তাকে ভেতর থেকে ছাদে তুলে আনে। সারা দিন অসহ্য ব্যথা ভোগের পর শেষ বিকেলে, মাত্র সাড়ে আট মাসে, স্টোর রুমের কাছে হেজের গলিতে পুরনো শাড়ি দিয়ে ঘেরা আঁতুড়ঘরে সে প্রসব করল ঠোঁটকাটা এক পুত্রসন্তান। তখনো সে বেঁহুশ, পাখির ছানার মতো নাতির ক্ষীণকণ্ঠের অবিরাম কান্না থামানোর চেষ্টায় ব্যস্ত তার শাশুড়ি। স্বামী ও দেবর অসহায়ের মতো দূরে দাঁড়িয়ে মাস্টারের গালি হজম করছে। স্বামী লজ্জিত মুখে করজোড়ে ক্ষমা চায়, 'বদ্দা বদ্দা, আর ভুল ন অইব বদ্দা। আঁই সব ধুইমুছি সাফ গরি দিয়্যুম বদ্দা।'

মাস্টার বলল, 'ওরে মাদারচোদ, হবে না আবার কি, হয়েও তো গেছে। সব তো দিলি তেইশ মেরে।' মাদারচোদ গালিটা ইয়াসমিনের স্বামীর হজম করতে কষ্ট হয়। অন্য সময় হলে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়ত। এখন তার হাত-পা বাঁধা, আরো খারাপ গালি হলেও হজম না করে উপায় নেই। নোয়ানো মাথা সোজা করার সাহস পায় না সে। সন্তানের বাবা হয়ে যেন সে মহাঅপরাধ করে ফেলেছে, যার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, যে দণ্ড কার্যকর করা হয় হাত-পা বেঁধে সাগরে ফেলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। যাত্রার শুরুতে শিশুটির জন্ম হলে মাস্টার তা-ই করত। তাকে না মারলেও তার বউ-বাচ্চাকে নিশ্চিত সাগরে ছুড়ে ফেলে দিত। জাহাজ এখন গন্তব্যের কাছাকাছি, পাজুবানের হাতে আদমদের তুলে দিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই তারা দেশের উদ্দেশে রওনা দেবে, শেষবেলায় আর খুনখারাবি করতে চায় না। খুন মানে একটা মাথা কমে যাওয়া। পাজুবান মাথা গুনে টাকা দেবে। প্রতি মাথা পনেরো হাজার বাথ। একটা মাথা কমে যাওয়া মানে পনেরো হাজার বাথ কমে যাওয়া।

তা ছাড়া মৃত্যু দেখতে দেখতে মাস্টার ক্লান্ত। মৃত্যু তো নাটক-সিনেমা নয়। কত আর দেখা যায়। কম তো দেখেনি। যাত্রার পর থেকে এ পর্যন্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সতেরোজন আদমকে মরতে দেখেছে। নিজেরা মেরেছে তিনজন। প্রথম দিন দুজন, অষ্টম দিন আরো একজন, যে বাবুর্চিকে ধাক্কা মেরে ডেক্সি থেকে তরকারি কেড়ে নিতে চেয়েছিল। পারেনি। কজিকাটা মাসুক তার ঘাড় ধরে আন্নিতে তুলে এক লাথিতে সাগরে ফেলে দিয়েছে। তার মতো জ্যান্ত আরো সাতজনকে সাগরে ফেলে দিয়েছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল ভীষণ। মায়াবী চোখের রশিদা তো গেলই, তার মতো গেল আরো দুজন। কোথায় গেল কেউ জানল না। আর ধর্ষণের সময় চিৎকার করছিল বলে আরেক মহিলাকে গলায় গামছা পেঁচিয়ে হত্যা করেছে এক প্রহরী।

মৃত্যুর সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে পনেরোই মার্চ সন্ধ্যায়। যাত্রীরা প্রতিদিনের মতো যখন হেজে ঢুকে গেছে। জাহাজিরাও কেবিনে উঠে গেছে। চিৎকার করতে করতে লিস্টার ইঞ্জিনের সঙ্গে মাথা ঠুকতে লাগল এক রোহিঙ্গা যুবক। মাত্র কয়েক ঠোকায় খুলি ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রহরীরা ছুটে এসে ফুটবলের মতো কিক মেরে রেলিংয়ের সঙ্গে ঠেসে ধরল তাকে। একজন টানতে টানতে মাথাটা ঢুকিয়ে দিল রেলিংয়ের ফাঁকে, আরেকজন পা ধরে দিল টান। রডের সঙ্গে আঁটকে তার ঘাড়টা গেল মটকে। তখন যে চিৎকারটা সে দিল, না-মানুষ না-পশুর কণ্ঠে, ছাদে

দুর্বলচিত্তের কেউ থাকলে নিশ্চিত জ্ঞান হারাত। ওভাবে আটকে থেকে মৃত্যুযন্ত্রণায় সে কাতরাতে থাকে, মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে। একটা সময় কাতরানি থামল। হয়ত বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। ঘণ্টাখানেক বেহুঁশ পড়ে থাকার পর প্রহরীরা তাকে রেলিংয়ের ফাঁক থেকে টেনে বের করে ময়লার বস্তার মতো ছুড়ে ফেলল সাগরে।

এখানেই থেমে যেতে পারত মৃত্যুর মিছিল। মাস্টারও তাই চেয়েছিল। নির্দেশ দিয়েছিল কেউ অসুস্থ হলে যতটা সম্ভব সেবাযত্ন করে যেন বাঁচিয়ে রাখা হয়। কিন্তু মৃত্যুর লাগাম তো তার হাতে নেই। মৃত্যু কোথা থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় কেউ জানে না, কেউ কোনোদিন দেখেনি। মৃত্যু কখন, কেন, কীভাবে আসবে তার কিছুই জানে না মানুষ। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি তিন দিন পর বৈশাখী ঝড়ের মতো অতর্কিতে হানা দেবে যম। মার্চের আঠারো তারিখ ছিল সেদিন। সকাল থেকে আসগর বাবুর্চিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। জাহাজের কোনাকাঞ্চি সব তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। কোথাও নেই। হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল বাবুর্চি? মধ্যবয়সি এক রোহিঙ্গা বলে বেড়াতে লাগল সাগরের মস্ত কুমির নাকি পিঠের লম্বা শিকল দিয়ে বাবুর্চিকে টেনে নিয়ে গেছে। যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। কখন আবার কাকে টেনে নেয় কুমির! কবে কার কাছে শোনা কুমিরের আরেক গল্প শুনিয়ে আতঙ্ক আরো বাড়িয়ে দিল জুলফিকার। গল্পটা বলার আগে সে ভূমিকা হিসেবে খানিকক্ষণ আটলান্টিক মহাসাগরের বর্ণনা দেয়। সেই সাগরের পানির রং কেমন, কী কী প্রকারের মাছ রয়েছে, সাগরটা পাড়ি দিতে কতদিন লাগে এবং পৃথিবীর কত ভাগ জায়গাজুড়ে সাগরটির অবস্থান ইত্যাদি বর্ণনা দেয়। বর্ণনা শুনতে শুনতে যাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে মূল গল্পে ঢোকে। ঘটনাটা আটলান্টিক মহাসাগরের। সাততলা একটি জাহাজ যাচ্ছিল ভারত মহাসাগরে। হঠাৎ তুফান উঠল। শুরু হলো ঢেউয়ের গর্জন। নাবিকরা তো অবাক। আকাশে মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই অথচ উঠল কিনা তুফান! তাদের বিস্ময় কাটার আগেই সহসা তুফান থেমে গেল। তারপর যে ঘটনাটি ঘটল তা বলতে জুলফিকার দুবার দম নেয়। উৎসুক যাত্রীরা তার মুখ থেকে চোখ সরায় না। সবার মুখে একই প্রশ্ন, 'কী ঘটেছিল?' জুলফিকার বলল, 'বড় একটা কুমির লেঙ্গুরের বাড়ি দিয়ে সাততলা জাহাজটাক সাগরোত ডুবে দিলো!'

এমন আশ্চর্য ঘটনা শুনে কার কলিজা আর পিঞ্জরে থাকে! ভয়ে কেউ ছাদে ওঠার সাহস পায় না। বাবুর্চিকে নিয়ে জাহাজিরা ভীষণ চিন্তিত। জলজ্যান্ত একটা মানুষ হঠাৎ কোথায় গায়েব হয়ে গেল! মাস্টারের ধারণা আদমেরা তাকে সাগরে ফেলে হত্যা করেছে। ক্ষুধার্ত মানুষ পারে না এমন কিছু নেই। বেঁচে থাকার জন্য হত্যাকে মানুষ বৈধতা দেয়। সন্দেহজনক যে ক'জন যাত্রীকে মারধর করে সে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করল, তাদের মধ্যে জুলফিকার একজন। জুলফিকার যে যখন-তখন বাবুর্চিকে গালাগাল করত এ কথা তার অজানা ছিল না। কাঠের মস্ত একটা চেলি নিয়ে মাস্টার তাকে জেরা শুরু করল, 'তুই-ই জানিস। হুজুর মানুষ, খবরদার, মিথ্যে কথা বলবি না একদম। বল, বাবুর্চি কোথায়?'

মাস্টারের কথা শুনে জুলফিকারের মাথা তো আবারও খারাপ হওয়ার জোগাড়। বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। ভাবে, মাঝেমধ্যে চিট তো দেখা দেয় তার মাথায়, মাস্টার তো পুরোপুরি সুস্থ একজন মানুষ, সে এমন উল্টাপাল্টা বকছে কেন? নাকি তারও চিট দেখা দিল! মাথায় তর্জনীর ডগা ঠুকতে ঠুকতে বলল, 'সুস্তো আচে তো মাস্টার? নাকি গ্যাচে?' মাস্টারের মাথায় চিট কি আর না উঠে পারে! জুলফিকারের পাছায় কষে একটা বাড়ি দিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, 'আমার মাথায় চিট? শালা রানখোর মোল্লা!' জুলফিকার নড়ে না। ঠোঁঠের কোণে বিদ্রূপের হাসি ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নির্বিকার। তাতে মাস্টারের মেজাজ আরো খারাপ হয়। হবে না? সে মারছে, অথচ মার খাওয়া লোকটি একটু আহা-উহু করবে না, তা কি সহ্য হয়? কষিয়ে আরও একটা বাড়ি দেয়। জুলফিকার তবু অনড়। মাস্টার এবার ভড়কে যায়। আশ্চর্য! গণ্ডারের চামড়া নাকি লোকটার! রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে জুলফিকারের নাকের কাছে আঙুল নাড়াতে নাড়াতে শাঁসায়, 'শেষবারের মতো বলছি, সত্যি করে বল, বাবুর্চি কোথায়।'

'জানি না।'

'জানিস না?'

'না।'

'মেরে সাগরে ভাসিয়ে দিব শালা।'

'মরেই তো আচি, ভাসে দিলেই বরং বাঁচি।'

মাস্টারের আঙুলটা নেমে গেল। এতক্ষণ যেন আঙুলটা নামার অপেক্ষাই করছিল জুলফিকার। বুক টানটান করে সে তার মুখোমুখি দাঁড়াল। হাত দুটো পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে বলল, 'মাস্টার, মানুষ মারা মহাপাপ। এই সত্যি কতা হামি আগে বুজিচ্চিনুনো, একন বুজি। এই সত্য বুঝতে হামার জীবনের ম্যালা সময় লষ্ট করা লাগচে, বুঝলেন। হামাক মারে কুনু লাভ নাই। মানুষ খারাপ আচলো না বাবুর্চি। আল্লা তার হায়াত দরাজ করুক, মরে গেলে বেহেস্তো নসিব করুক।'

কথা শেষ করে জুলফিকার এক মুহূর্তও দাঁড়াল না, সোজা নেমে গেল হেজে। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থেকে কেবিনে উঠে গেল মাস্টার। নানা প্রশ্ন উঁকি দেয় তার মাথায়। তার মনে হয়, বাবুর্চি নিশ্চয়ই খুন হয়েছে। নইলে কোথায় গেল? তার কি ডানা আছে যে উড়ে যাবে! কিন্তু কে খুন করতে পারে তাকে? যাত্রীরা, নাকি জাহাজিদের কেউ? এক মন বলে যাত্রীরা, আরেক মন বলে জাহাজিরা। সন্দেহের পাল্লাটা ঝোঁকে জাহাজিদের দিকেই। হতেও তো পারে। নিত্য যারা গুম-খুনে মেতে থাকে তারা তো আপন-পর বোঝে না, ঠুনকো কারণে যাকে-তাকে খুন করাটা তাদের কাছে মামুলি ব্যাপার। তার সন্দেহ হয় কজিকাটা মাসুককে। সরাসরি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না। মাসুকের জাহাজের প্রহরী হলে কি হবে, মূলত সে পাজুবানের লোক। টাকা লেনদেন হয় তার হাত দিয়েই। তার সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি। জাহাজিদের কথা শুনে আবার এই সন্দেহেও বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারে না। এক সুকানি জোর গলায় বলে, 'আমি নিশ্চিত, আদমরাই বাবুর্চিকে হত্যা করেছে।' আরেকজন বলে, 'বাবুর্চি হয়ত আত্মহত্যা করেছে।' টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিনগামী সি-ট্রাক থেকে লাফ দেওয়া মদ্যপ চার মাতালের উদাহরণ টেনে এক গ্রিজার প্রশ্ন তোলে, 'রাতে কি বাবুর্চি মদ খেয়েছিল? পানির প্রতি মাতালদের কিন্তু ঝোঁক বেশি থাকে।' কজিকাটা মাসুক বলে, 'সাগরের দৈত্য-দানোরা বাবুর্চিকে তুলে নিল না তো!' আরেক প্রহরী বলে এক আজগুবি কথা। মধ্যরাতে নাকি কাণ্ড বুড়ো সমুদ্র থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বাবুর্চির রুমে ঢুকে তাকে টেনে নিয়ে গেছে। মাস্টার তাকে কষে ধমক লাগায়, 'গাঁঞ্জা খাইছস বেটা?'

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও স্টোর রুমের চাবি না পেয়ে বেলা দশটার দিকে যখন তালা ভাঙা হলো মাস্টার তখন মোটামুটি নিশ্চিত হলো যে রাতে নিশ্চয়ই জলদস্যুরা হানা দিয়েছিল। বাবুর্চিকে হত্যা করে তারা স্টোর রুম লুটপাট করে যা পেয়েছে নিয়ে গেছে।

কথাটা উড়িয়ে দিতে পারে না জাহাজিরা। হতেও তো পারে। নইলে খাবারের বস্তাগুলো কোথায় গেল?

কমলের মন সাক্ষী দেয় অন্য কথা। তার কেন যেন মনে হয় বাবুর্চি নিশ্চয়ই সাগরে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। মনে হওয়ার পেছনে কারণ আছে। রশিদা ধর্ষণের ঘটনায় বাবুর্চির বদলে যাওয়াটা কমলই প্রথম টের পেয়েছিল। সেদিন দাবার টেবিলে দীর্ঘ আলাপচারিতার পর বিকেলে বাবুর্চি তাকে গোপনে ছোট্ট এক প্যাকেট মেরি বিস্কুট খেতে দিয়েছিল। প্যাকেটটা দেওয়ার সময় বারবারই বলছিল, 'সাবধান, কেউ যেন না জানে।' কমল বলেছিল, 'উপকারীর ক্ষতি কেউ চায় চাচা? আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, আমি কাউকে বলব না।'

দ্বিতীয়বার টের পায় চৌদ্দই মার্চ রাতে। জুলফিকারের মাথায় চতুর্থবারের মতো সেদিন গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল। এমনই চলছিল তার। মাথা একদিন ভালো তো একদিন খারাপ। ভালোর সময় এমনই ভালো, দেখে কেউ বলবে না তার মাথায় চিট আছে। আবার খারাপের সময় এতটাই খারাপ, কেউ তার চোখের দিকে তাকানোর সাহস পায় না। তার এই পাগলামির জন্য জাহাজিরা অনেক আগেই তাকে খতম করে দিতে পারত। না করার একটাই কারণ, সে একজন মাওলানা। পৃথিবীর যত অপরাধ আছে জাহাজিরা সবই করতে পারে, তাই বলে একজন আলেমকে তো হত্যা করতে পারে না। তা ছাড়া যতই পাগলামি করুক, কারো গায়ে জুলফিকার হাত তোলে না। সারাক্ষণ শুধু মার্কিন সৈন্যদের গালাগাল করে আর মাঝেমধ্যে হায়দর আলীকে খুঁজে বেড়ায়। একবার ওপরে ওঠে তো ফের নিচে নামে। ওঠানামা করতে করতে বকে চলে, 'কুন্টি বদমাশটা কুন্টি? শালার বেটাক আংরা করে হামি চাবে খামো। চুদির ভাই হামার জীবনডা মাটি কোরে দেচে।'

সেদিনও এমন আবোল-তাবোল বকছিল। রাতে বাবুর্চি যখন পলিথিনের ঠোঙায় করে যাত্রীদের সেদ্ধ ছোলা খেতে দেয়, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জুলফিকার গালাগাল শুরু করল, 'হারামখোর, নাফরমান, নালায়েক, বদমাইশ, বেয়াদব।' বাবুর্চি ভুড়ি নাচিয়ে হে হে করে হাসে। হাসির সঙ্গে ভোঁস ভোঁস জর্দার গন্ধ বের হয়। বেহায়ার মতো তার অমন হাসির কারণ খুঁজে পায় না যাত্রীরা। গালি খেয়েও কিনা হাসছে! বাবুর্চি এত ভালো হলো কবে? নিজের ঠোঙাটা নিয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে জুলফিকার বলে, 'হাসপুনো খবিস। হাসলে তোকে কুত্তোর লাগান লাগে।' এই কথায় বাবুর্চি আরো জোরে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে কয়েক মুহূর্ত জুলফিকারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর তাকে অবাক করে দিয়ে ছোলার আরেকটি ঠোঙা বাড়িয়ে ধরে বলে, 'এই নেন হুজুর। লাগলে বলবেন, আরো দিমু।'

ঠোঙাটা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় জুলফিকার। কলঘরের আড়ালে গিয়ে চুপচাপ খায়। একবারও আর পেছনে ফিরে তাকায় না। যে মুখে বাবুর্চিকে গালি দিয়েছে সেই মুখ যেন আর তাকে দেখাতে চায় না। বাবুর্চির এই উদারতা দেখে বাকিরা কি আর চুপটি করে বসে থাকতে পারে? শুরু হয়ে গেল ঠেলাঠেলি। বাবুর্চি কাউকে নিরাশ করে না। এক ঠোঙা নিয়ে ওসমান আবার ঘুরে আসে। হাতটা বাড়িয়ে দেয়। বাবুর্চি আরো দুই ঠোঙা তুলে দেয় তার হাতে। বিস্ময়ে নড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলে ওসমান। পলক ফেলতেও ভুলে যায়। এই তো সেদিনের কথা, ফিরতি এক ঠোঙা ভাত চেয়েছিল বলে কী ধমকটাই না দিয়েছিল বাবুর্চি! অথচ এখন! কী অবাক কাণ্ড! বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় তার। বাবুর্চি বলে, 'হাঁ করে কী দেখতেছ মিয়া? মাইর খাইবার আগে ভাগো।'

বাবুর্চি যে সত্যি সতি বদলে গিয়েছিল সে-রাতেই তৃতীয় এবং শেষবারের মতো টের পেয়েছিল কমল। রাত তখন তৃতীয় প্রহরে। প্রচণ্ড ক্ষুধায় নিজের বুড়ো আঙুল চিবিয়ে খাওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখে কমলের ঘুম ভেঙে যায়। পেশাবেরও বেগ পায় খুব। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে ঘুম ঘুম চোখে সে ছাদে উঠল। ফাঁকা ছাদ। গলা পর্যন্ত মদ খেয়ে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে জাহাজিরা। ঠান্ডা হাওয়া বইছে খুব। মাস্তুলের বাতিটা জ্বলছে শুকতারার মতো। নির্দিষ্ট সময় বিরতি নিয়ে বাবুর্চির হাতের টর্চটা জ্বলছে আর শোনা যাচ্ছে তার ফুসফুস ঝাঁঝরা করা কাশি। হাঁচিও দিচ্ছে মাঝেমধ্যে। ছাদে পা ফেলা মাত্রই টর্চের আলো পড়ল কমলের চোখে এবং ভেসে এলো পরিচিত কণ্ঠ, 'টয়লেটে?'

'কে? বাবুর্চি চাচা?'

'আমি ছাড়া আর কে।'

'ঘুমাননি এখনো?'

'আজ আমার ডিউটির পালা, ঘুমামু কেমন করে।'

'আচ্ছা।'

'শোনো।'

'জি।'

'আমার রুমে আস, দরকারি কথা আছে।'

দরকারি কথা! কমলের খটকা লাগে। একজন আদমের সঙ্গে একজন জাহাজির কী এমন দরকারি কথা থাকতে পারে। টয়লেট থেকে বেরিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে সে বাবুর্চির রুমে ঢুকল। ছোট্ট রুম। এক পাশে মাপা সাড়ে তিন হাত লোহার চকি, তার পাশে হাঁটাচলা করার মতো সামান্য ফাঁকা জায়গা। বাবুর্চি তাকে বসতে বলল। পা ঝুলিয়ে চকির ওপর বসল কমল। অন্ধকারে তাকে বসিয়ে রেখে টর্চটা হাতে নিয়ে চুলাঘরে গেল বাবুর্চি। ফিরে এলো এক থালা ঠান্ডা ভাত আর এক বাটি আলুর তরকারি নিয়ে। চকির উপর রেখে বলল, 'তাড়াতাড়ি খাও। 'কেউ দেখে ফেললে ঝামেলায় পড়ে যাব।' আধোয়া হাতেই খেতে শুরু করল কমল। বাবুর্চি টর্চটা জ্বালিয়ে রেখে তার খাওয়া দেখে। কমল খায় আর ফিরে ফিরে তার মুখের দিকে তাকায়। একটা বাড়তি পোড়া মরিচ চাইলে যে মারতে ধরে সে কিনা ডেকে এনে ভাত খেতে দিল! স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হয় তার। একবার মনে হলো, ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিল না তো! আবার ভাবল, না, বিষ কেন মেশাবে। জাহাজিরা কাউকে মারতে চাইলে কি আর গোপনে বিষ খাওয়ানোর দরকার হয়? আধাআধি খেয়ে মনে পড়ে গেল সেই শঙ্কাটি, জাহাজে ওঠার প্রথম দিন যা তার মনে উঁকি দিয়েছিল, ভাতের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে চোখ আর কিডনি খুলে নেবে না তো!

খাওয়া শেষে অন্ধকারে হাতড়ে কলঘরে গিয়ে হাত ধুয়ে আবার রুমে ফিরল কমল। বাবুর্চি তাকে বসতে বলে চকির নিচ থেকে টেনে বের করে আনলো জংধরা একটা ট্রাংক। কোমরে গোঁজা গোছা থেকে একটি চাবি বের করে ট্রাংকের তালাটা খুলল। ভেতর থেকে বের করে আনল এক বাণ্ডিল টাকা। এক শ আর পাঁচ শ টাকার নোট। একটি একটি করে নোটগুলো গুনল। তারপর বাণ্ডিলটা কমলের হাতে দিয়ে বলল, 'কুড়ি হাজার আছে এখানে। সাবধানে রাখবা।'

কমলের মনে হলো বাণ্ডিলটা বুঝি তার। ঠিক এরকম একটি বাণ্ডিলই তো সেদিন গোরকঘাটায় তার ব্যাগ থেকে অপহরণকারীরা ছিনিয়ে নিয়েছিল। খোয়ানো টাকা ফেরত পেয়েছে ভেবে আনন্দে তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একবার নেড়েচেড়ে দেখে বলল, 'কোথায় পেলেন টাকাগুলো?'

'আমার।'

'আপনার?'

'হ্যাঁ। মেলা কষ্ট করে এই টাকা জমাইছি বাজান।'

মুখের পাংশু হয়ে যাওয়াটা ঠেকিয়ে রাখতে পারে না কমল। সে চুপ করে থাকে। নিরাশায় অথবা বিস্ময়ে। বান্ডিলটা আরেকবার নেড়েচেড়ে বাবুর্চির মুখের দিকে তাকাল।

'অনেক কষ্টের টাকা। আমানত রাখলাম তোমার কাছে। আমার বিশ্বাস, আমানতের খেয়ানত তুমি করবা না।'

কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারে না কমল। মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয় না, চোখ দুটির পলকও পড়ে না, দৃষ্টিটা স্থির হয়ে থাকে বাবুর্চির মুখের ওপর। তার মতো অপহৃত একজন আদমকে, দুদিন বাদে যাকে বেচে দেওয়া হবে পাজুবানের কাছে, ডেকে এনে খেতে দিল, তার কাছে আবার টাকাও আমানত রাখল, বাবুর্চির মতলব কী? শেষে আবার চোর সাব্যস্ত করে মেরে সাগরে ভাসিয়ে দেবে না তো!

'যত্ন করে রাখবা। দুই-এক টাকা করে জমাতে জমাতে কুড়ি হাজার করেছি। অনেক কষ্টের টাকা, অনেক।' বলতে বলতে বাবুর্চির চোখ ভিজে উঠল।

বিস্ময়ে কমল এবার বলেই ফেলল, 'ব্যাপারটা কী বলুন তো চাচা?'

উত্তর দিল না বাবুর্চি। বাণ্ডিলটা কমলের ব্যাগে ঢুকিয়ে ঝটপট চেইন লাগিয়ে দিল। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে হেজের গলি ধরে আন্নির দিকে হাঁটা ধরল। মাস্তুলের ক্ষীণ আলোয় কমল তার পিছু পিছু হাঁটে। ঠান্ডা বাতাসে বা ভয়ে বা বিস্ময়ে তার বুক কাঁপে।

স্টোর রুমের দরজার কাছে থামল বাবুর্চি। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। চাবির গোছাটি বের করে দরজার তালাটা খুলল। ভেতর থেকে একটা বস্তা টেনে বের করে নিচু গলায় বলল, 'ধরো।' কমল ধরল। দুজনে ধরাধরি করে সিঁড়ি বেয়ে এক নম্বর হেজে নামল। কারো ঘুম না ভাঙিয়ে সিথানে সিথানে একটি করে চিড়া-গুড়ের ঠোঙা রেখে দিল। বস্তাটা খালি করে আবার ছাদে উঠে আরেকটা বস্তা নিয়ে দুই নম্বর হেজে নামে এবং একইভাবে একটি করে ঠোঙা সিথানে সিথানে রেখে দিল।

সিথানে সিথানে চিড়া-গুড়ের ঠোঙা কে রেখেছে যাত্রীরা ভেবে পায় না। জুলফিকার জোর গলায় বলে, 'সবই খোদার ইশারা। মানুষের দুর্ভোগ দেখে খোদার রহমতের দরিয়ায় মৌজ উঠেছে। কুদরতি হাতে সিথানে সিথানে তিনি খাবার রেখে গেছেন।'

যাত্রীরা হাসে। এক বাঙালি বলেই ফেলে, 'হুজুরে গাঁজা খাইয়ে পাঁল্লার।' বাঙালি-রোহিঙ্গা সবার সন্দেহ কমলকে। এত দিনে তারা এই কথাটি বুঝেছে মানুষ হিসেবে কমল ভিন্ন ধাঁচের। কারো সঙ্গেই মেলে না। অন্তরটা তার দয়ার সাগর। কারো সঙ্গে বিবাদে জড়ায় না, কেউ চোখ রাঙালেও হেসে উড়িয়ে দেয়, নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়ানোর চেষ্টা করে। বাবুর্চির সঙ্গে খাতির করে মাস্টারের অজান্তে হয়ত এই বাড়তি খাবারের ব্যবস্থা কমলই করেছে। বাবুর্চিকে জিজ্ঞেস করবে সেই সাহসও কেউ পায় না। পাছে কমল যদি ধরা পড়ে যায়! কেন ভালো মানুষটাকে বিপদে ফেলবে। কিন্তু কানাকানির মাত্রা বেড়ে গেলে গোপন কথাটা আর গোপন রাখতে পারে না কমল। এই বলে সবাইকে সে সাবধান করে দেয়, 'কোনোভাবেই যেন জাহাজিদের কানে কথাটা না যায়। গেলে আমাকে তো মারবেই, বাবুর্চিকেও আস্ত রাখবে না।'

চুরি করে যাত্রীদের খাবার দেওয়ার পর বাবুর্চির প্রতি কমলের সব সন্দেহ আর অবিশ্বাস কেটে যায়। বুঝতে আর বাকি থাকে না, যে বাবুর্চির মুখের

দিকে তাকালে ভয়ে সবাই ঠান্ডা হয়ে যেত, সেই বাবুর্চি আর এই বাবুর্চির মধ্যে অনেক ফারাক। সে এখন সম্পূর্ণ বদলে যাওয়া এক মানুষ। দাবার টেবিলে কথা বলতে বলতে সেদিনই সে টের পেয়েছিল লোকটা দ্বৈতসত্তার অধিকারী। শুভসত্তাকে যথাসাধ্য আড়াল করে রাখে বাধ্য হয়ে। বাধ্য, কারণ সে মাস্টারের অধীন সামান্য এক বাবুর্চি। ইচ্ছে করলেই তার হুকুমের বাইরে সে কিছু করতে পারে না। তার হুকুমেই সে শুভসত্তাটাকে সবসময় আড়াল করে রাখে, যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, বাড়তি খাবারের কথা শুনলে গালি দেয়, গায়ে হাত তুলতেও ছাড়ে না। আর কেউ না বুঝুক, কমল বোঝে, এসব তার অভিনয়। ঝানু অভিনেতার মতো একটা মুখোশ পরে অবিরাম অভিনয় চালিয়ে যায়। কিন্তু যখন একা থাকে, নিরালা দুপুরে বা নিশিরাতে, মুখোশটা তখন খুলে রাখে। তখন তাকে আর চেনা যায় না। খোদ মাস্টারও চিনতে পারবে না। পৃথিবীর কেউ না জানুক, সিতারাবানু জানে, রোজ রাতে ঘুমানোর আগে সে কাঁদে। কখনো উচ্চস্বরে, কখনো নিঃশব্দে। কখনো মদ খেয়ে মাতাল হয়ে মাস্টারব্রিজের ছাদে উঠে পাজুবান অংকাচোতেফানের গণগুষ্টি ধরে গালাগাল করে, যেমন করেছিল প্রথম রাতে, চোখের সামনে সন্তানের মতো একটি মেয়েকে ধর্ষিত হতে দেখে। সেদিনই প্রথম তার মুখোশটি খসে পড়েছিল। মুখোশের আড়ালে তার সরল মুখটা দেখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল রশিদা। দাবার টেবিলে কমলের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতায় দ্বিতীয়বারের মতো খসে যায়। মৃত্যুর মুখ থেকে শিবলিকে ফিরিয়ে আনার পর চিরতরে খসে যায়। হারানো মুখোশটা সে খোঁজে। কোথাও পায় না। চেষ্টা করে যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে। পারে না। চেহারায় আগের সেই কাঠিন্য ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। পারে না। কীভাবে পারবে? মুখোশ যে নেই! সে তো নিজেরই অজান্তে হয়ে উঠেছে সংবেদনশীল এক মানুষ, জলভাসী নিরন্ন আদমদের সীমাহীন দুর্ভোগ দেখে যার বুকটা দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

ষোলোই মার্চ সারা দিন কেটে গেল, এক মুঠো ভাত তো দূরে থাক, দুপুরে এক মগ করে পানি ছাড়া কাউকে একটা বিস্কুট পর্যন্ত খেতে দিল না। দুপুরে বাবুর্চি ভাত দিতে চেয়েছিল, মাস্টার ধমক দিয়ে বলেছে, 'তোমার দরদ দেখি একেবারে উথলে উঠেছে! ফকিরের বাচ্চারা কি তোমার শালা-সমুন্দি লাগে?' বাবুর্চি চুপসে গেল। সারা দিন তাকে আর দেখা গেল না, শরীর খারাপের অজুহাতে দিনটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল। মধ্যরাতে টর্চ হাতে রুম থেকে বেরিয়ে গোটা জাহাজ চক্কর দিল একবার। কোথাও কেউ নেই। রুমে রুমে কান পাতল। কেউ জেগে নেই। নিঃশব্দে স্টোর রুমের দরজা খুলে চিড়া আর টোস্ট বিস্কুটের বস্তা নিয়ে হেজে নামল। তার পায়ের শব্দে যাত্রীদের ঘুম ভেঙে যায়। হয়ত তারা ঘুমায়নি, জেগে জেগে তারই প্রতীক্ষা করছিল। চিড়া আর বিস্কুট বিতরণ শেষ করে কলঘরের দরজা খুলে দেয়। নিঃশব্দে সবাই পেট ভরে পানি খায়। কেউ কেউ বোতলে ভরে নিয়েও যায়। শেষ রাতে স্টোর রুমে ঢুকে বাবুর্চি দেখল খাবারের মজুদ প্রায় শেষ। অবশিষ্ট আছে শুধু আধা বস্তা চিড়া, কিছু গুড় আর কিছু চাল ডাল আলু।

কমলের মন বারবার সাক্ষী দেয়, এই খাদ্যসংকটই হয়ত বাবুর্চির আত্মহত্যার কারণ। আত্মহত্যা ছাড়া মুক্তির আর কোনো পথ হয়ত খুঁজে পায়নি। মুক্তি, কারণ, জাহাজ কবে আবার নোঙর তুলবে তার তো কোনো ঠিক নেই। এত দিন কী খেয়ে বেঁচে থাকবে এতগুলো মানুষ? তাদের নির্মম পরিণতি হয়ত সে আগে থেকে টের পেয়েছিল। চোখের সামনে অভুক্ত মানুষদের মৃত্যু সহ্য করা হয়ত তার পক্ষে সম্ভব হতো না। তা ছাড়া মাস্টারকেই বা কী জবাব দিত? কোনো না কোনোভাবে মাস্টার তো জেনে যেত তারই বিশ্বাসঘাতকতায় খাবারের মজুদ ফুরিয়ে গেছে। সে কি তখন তাকে আর জ্যান্ত রাখত? অন্যের হাতে মৃত্যুর চেয়ে হয়ত সে আত্মহত্যাকেই শ্রেয় মনে করেছে। হয়ত মধ্যরাতে, চাঁদ আর নক্ষত্র, মাছ আর সিতারাবানু ছাড়া সবাই যখন গভীর ঘুমে, সাগরে ঝাঁপ দিয়ে সব কিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে। কিন্তু কথাটা কাউকে বলার সাহস পায় না কমল। যদি তাকেই খুনি সাব্যস্ত করে সবাই!

দুপুরে মাস্টার যখন কেবিনের দোতলায় বসে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে জাহাজিদের সঙ্গে আলোচনা করছিল তখনই অতর্কিতে হানা দিল যম। বিপুল আক্রোশে। দেহ থেকে প্রাণটা কেড়ে নেওয়ার জন্য যমের তো একটা অসিলা লাগে। অসিলাটা ছিল বাঙালি-রোহিঙ্গার সংঘর্ষ। স্টোর রুমের অবশিষ্ট খাবার নিয়ে সংঘর্ষের সূত্রপাত। খাদ্যসংকটের খবর পেয়ে

রোহিঙ্গাদের একটি দল স্টোর রুমে হানা দেয়। খাবারের বস্তাগুলো নিয়ে তারা যখন এক নম্বর হেজে নামছিল, বাধা দিল বাঙালিদের একটি দল। বস্তাগুলো কেড়ে নিল তাদের কাছ থেকে। এই নিয়ে প্রথমে বাগ্‌বিতণ্ডা, তারপর কাড়াকাড়ি এবং তারপর শুরু হলো মারামারি। এই ফাঁকে ওসমান ও তালেব ইঁদুরের মতো চিড়ার বস্তাটা নিয়ে দুই নম্বর হেজে নামতে গেলে সিঁড়ির মুখে পথ আগলে দাঁড়াল রোহিঙ্গাদের আরেকটি দল। বস্তাটা কেড়ে নিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল দুজনকে। তালেব না হয় ভীরু, কেউ তাকে মেরে ফেললেও একটিবার মারার কারণ জিজ্ঞেস করবে না, কিন্তু ওসমান তো একতরফা মার খাওয়ার ছেলে নয়। এক রোহিঙ্গার নাক বরাবর মারল প্রচণ্ড একটা ঘুষি। শুরু হলো ঘুষাঘুষি। একদল ঘুষাঘুষি করছে সিঁড়ির মুখে, আরেক দল স্টোর রুমের গলিতে। দুই পক্ষের মাঝখানে দাঁড়াল কমল। শান্ত করার চেষ্টা করল।

হয়ত তারা শান্ত হতো, যদি না গুজবটা ছড়াত। বাঙালি-রোহিঙ্গা মারামারি লাগার গুজবটা কে যে রটিয়ে দিল কে জানে। ওপর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে গুবজটা নিচে নামল। সঙ্গে সঙ্গে বাসাভাঙা পিঁপড়ার মতো হৈ হৈ করে সবাই ওপরে উঠে এলো। রোহিঙ্গারা যখন দেখল আঙুল নেড়ে কমল এক রোহিঙ্গাকে শাঁসাচ্ছে, তখন তাদের মাথায় রক্ত উঠে গেল। বাঙালি কেন রোহিঙ্গাকে শাঁসাবে? কোন সাহসে? কমলকে ঘিরে ধরে হৈচৈ শুরু করে দিল তারা। আচমকা একজন কমলের গালে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরে বসল। বাঙালিরা কি আর মুখে আঙুল দিয়ে বসে থাকতে পারে? মুহূর্তে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল যাত্রীরা। শুরু হয়ে গেল বাঙালি-রোহিঙ্গার তুমুল মারামারি।

ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হাবাগোবা আদমেরা এভাবে যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বে তা কল্পনাও করতে পারেনি মাস্টার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সে ঘাড়বে গেল। বলা তো যায় না কখন আবার তাদের ওপর হামলা করে বসে। কেবিনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে খানিকক্ষণ সে গালাগাল করল। এমন হট্টগোলের মধ্যে তার কণ্ঠ কি আর কারো কানে ঢোকে? গলায় কুলিয়ে উঠতে না পেরে মাইক চালু করে হুংকার ছাড়ল, 'এক মিনিটের মধ্যে ছাদ খালি না করলে গুলি করে মারব শুয়োরের বাচ্চারা।'

কেউ পাত্তাই দিল না তার হুংকার। উল্টো এক বাঙালি আঙুল নেড়ে তার উদ্দেশে হুংকার ছাড়ল, 'আগে তোরে খামু মাদারচোদ। তুই আসল নাটের গুরু।'

মাস্টারের নির্দেশে তক্তা, রড ও ডেগার হাতে সুকানি গ্রিজার ও প্রহরীরা ছাদে নামল। সামনে যাকে পেল ইচ্ছেমতো মার দিল। মার থেকে বাঁচতে হুড়মুড়িয়ে কেউ হেজে নেমে গেল, কেউ আন্নিতে উঠে গেল, কেউ কেবিনে উঠে গেল, পালানোর মতো জায়গা খুঁজে না পেয়ে কেউ সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। চারপাশের তরঙ্গসঙ্কুল জলে জালে আটকা পড়া মাছেদের মতো ভাসন্ত আদমেরা বাঁচার জন্য আর্তনাদ করে। কেউ জাহাজের কোনাকাঞ্চি ধরে ভেসে থাকে, কেউ ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে যায়, কাউকে হাঙর কুমির টেনে নেয়। জাহাজিরা কাউকে পিটিয়ে, কাউকে ফাঁস দিয়ে, কাউকে ছুরি মেরে হত্যা করে। যেন মানুষ হত্যার বুনো উৎসব শুরু হয় জাহাজজুড়ে। কজিকাটা মাসুক একই পরিবারের তিন রোহিঙ্গাকে তক্তা দিয়ে পিটিয়ে মাথাগুলো যখন গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল, রক্তে যখন ভেসে যাচ্ছিল হেজের গলি, জুলফিকার তখন মালেকুল মউতের রহমতের প্রত্যাশায় জোর গলায় আজান হাঁকা ধরল। ওসমান আর তালেব হেজের কোনায় বসে আল্লা আল্লা করতে থাকে। আন্নির সামনে একটা কাছি ধরে ঝুলে থাকে শিবলি।

কেবিনের বারান্দায় দাঁড়ানো মাস্টারের হাত দুটো ধরে কমল মিনতি করল, 'আপনার লোকদের থামতে বলেন মাস্টারসাব। দেখেন কীভাবে তারা মানুষ মারছে। প্লিজ, থামান তাদের।'

মাস্টার কি আর তার কথা পাত্তা দেয়! উল্টো ঝাড়ি মারে, 'তুই শালা কিডা?' আঙুল তুলে শাঁসায়, 'ভাগ মাদারি!'

সরে এলো কমল। ঘুষি খেয়ে চোখের কোণটা সুপারির মতো গোল হয়ে ফুলে উঠেছে। ফোলা জায়গাটা হাতের তালুয় চেপে ধরে মাস্টারব্রিজের ছাদে উঠে দীপঙ্করের পাশে দাঁড়াল সে। দীপঙ্করের চোখেমুখে ভয়। ডেগারের কোপে এক রোহিঙ্গার মুণ্ডু খসে যেতে দেখে সে থর থর করে কাঁপছে। কাঁপছে আর রাম ভগবানের নাম জপছে। খানিক পরপরই ভয়ার্ত কণ্ঠে বলছে, 'রক্ষা করো ভগবান।'

কমলের হাসি পেল। হাসতে হাসতে বলল, 'তুই না নাস্তিক?'

টানা দেড় ঘণ্টার সংঘর্ষে জাহাজিরা প্রায় একুশ যাত্রীকে ফাঁস দিয়ে মারল, তক্তা ও রড দিয়ে পিটিয়ে মারল এগারোজন, ছুরি মেরে সাগরে ফেলে দিল অন্তত কুড়িজন, আতঙ্কে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ হারাল প্রায় সাতাশিজন। বাকি থাকল চার শ তেইশজন। মার্চের বিশ তারিখ সকালে পাজুবানের লোকেরা যখন ট্রলারে করে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া চার শ তেইশ আদমকে থাই উপকূলের দিকে নিয়ে যাবে, পাটাতনে বসে কমল তার ডায়েরিতে লিখবে, 'একুশ শতকে পৃথিবীর কোথাও সমুদ্রে ভাসন্ত কোনো জাহাজে খাবারের জন্য এমন ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়েছে কিনা সন্দেহ। মানবসভ্যতা নামক এই শব্দবন্ধের যদি দৈহিক কাঠামো থাকত, মানবতার এমন পতন দেখে লজ্জায় সে চোখ ঢাকত।'

পাঁচ.

তালেব আর ওসমান শেষ পর্যন্ত মালয়েশিয়া পৌঁছতে পেরেছিল কিনা সিতারাবানু জানে না। হয়ত পেরেছে। চাকরিবাকরি নিয়ে হয়ত থিতু হতে পেরেছে স্বপ্নের দেশে। কিংবা পারেনি। এমনও হতে পারে, পেদাং বেসার বন্দিশিবির থেকে মুক্তি পেয়ে তাদের ঠাঁই হয়েছে অন্য কোনো বন্দিশিবিরে। পাচারকারীরা তো এক আদমকে এক বন্দিশিবিরে বেশিদিন রাখে না। থাইল্যান্ড আর মালয়েশিয়ায় কত যে বন্দিশিবির তার তো কোনো হিসাব নেই। রোগে-শোকে হয়ত তারা বন্দিশিবিরেই মরে গেছে। এমনও হতে পারে, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়ার পুলিশ বা নৌবাহিনীর হাতে আটক হয়ে কোনো থানাহাজত, আশ্রয়শিবির অথবা কোনো কারাগারে বন্দি। যেমন বন্দি শিবু। শুধু শিবু কেন, তিন দেশের অসংখ্য আশ্রয়শিবির আর কারাগারে বন্দি হয়ে পড়েছে অভিবাসনপ্রত্যাশী হাজার হাজার রোহিঙ্গা ও বাঙালি। অথবা এমনও হতে পারে, আন্দামান সাগরে তেল ফুরিয়ে যাওয়া কোনো ট্রলারে ভাসছে। কে জানে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা অথবা নৌডুবিতে মারাও যেতে পারে, যেভাবে মরেছে ভাগ্যাহত শত শত আদম। অথবা আন্তর্জাতিক কোনো মানবাধিকার সংস্থা আশ্রয়শিবির থেকে তাদের উদ্ধার করে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। তত দিনে তো সমুদ্রপথে মানব পাচারের এই গুপ্ত কাহিনি ফাঁস হয়ে গেছে। জেনে গেছে গোটা বিশ্ব। থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলের জঙ্গলে আবিষ্কার হচ্ছে ডজন ডজন বন্দিশিবির আর গণকবর। মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যাচ্ছে শত শত মানুষের কঙ্কাল। পৃথিবীর সব মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিকের চোখ এখন থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার দিকে। একযোগে মানব পাচারের ঘটনা প্রচার করছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো। শিউরে উঠছে মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষেরা। নিন্দার ঝড় বইছে বিশ্বজুড়ে। তথ্যপ্রযুক্তির এই উৎকর্ষের কালে মানবতার এমন বিপর্যয় ঘটতে পারে! উদ্বেগ জানিয়ে বিবৃতির পর বিবৃতি দিচ্ছে জাতিসংঘ। তাতে দারুণ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেছে মিয়ানমারের জান্তা সরকার। উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে দেশটি যে দায় এড়াতে পারে না, জোর দিয়ে বলছে সব দেশ, সব সংস্থা এবং বিশ্বের সব বিবেকবান মানুষ। কর্মসংস্থানের অভাবে এভাবে ঝুঁকি নিয়ে নাগরিকরা যে বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে, এ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারও কম বিব্রত নয়। তার চেয়েও বেশি বিব্রত থাইল্যান্ড। মানব পাচার রোধে ব্যর্থ হলে দেশটিকে নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। বাধ্য হয়ে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে দেশটির সরকার। মানব পাচারের মূল সন্দেহভাজন হিসেবে থাই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে পেদাং বেসারের মেয়র বানজং পোংফোলকে এবং হন্যে হয়ে খুঁজছে পাচারকারীচক্রের মূল হোতা পাজুবান অংকাচোতেফানকে। ঝুঁকিপূর্ণ অবৈধ অভিবাসন সমস্যার টেকসই সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টায় দফায় দফায় বৈঠকে বসছে জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থাসহ যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আসিয়ান দেশগুলো।

সিতারাবানু বলছে, এসব আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ থাক। কারণ এই বৃত্তান্ত সমুদ্রভাসা মানুষের। ওসমান আর তালেবের প্রসঙ্গও থাকুক। জোবায়ের শিবলি ওরফে শিবুকে, সন্তানের জন্য কাঁদতে কাঁদতে যার মায়ের চোখ শুকিয়ে গেছে, দেশে ফিরিয়ে আনার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা সে প্রসঙ্গও থাকুক। এই বৃত্তান্তে তাদের কথা আর একটিবার উচ্চারণ করতে সিতারাবানু অনিচ্ছুক। তার দৃষ্টি এখন আন্দামান সাগরে ভাসমান একটি মাছ ধরার ট্রলারের দিকে, বাঙালি ও রোহিঙ্গা মিলিয়ে যেখানে

আড়াইশ আদম, যাদের বেশিরভাগই সাউথ বেঙ্গল-৩-এর যাত্রী, যারা মৃত্যুকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে কিংবা মৃত্যু তাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। অতি ব্যবহারে জীর্ণ বহু বছরের পুরনো ট্রলার। এমন বেহাল দশা যে, মৌসুমি বায়ু গর্ভে নিয়ে সমুদ্র ক্ষেপে উঠলে ঢেউয়ের তোড়ে চোখের পলকে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। ট্রলারের মাঝি নেই, ইঞ্জিনে ডিজেল নেই, খাওয়ার মতো এক ফোঁটা পানি নেই। অলৌকিক সাহায্যের আশায় যাত্রীরা দুহাত তুলে কাঁদছে। শব্দহীন। নিরশ্রু।

সেদিন ভোরে পেদাং বেসার উপকূল থেকে ট্রলারটি নোঙর তোলার সময় তিনজন মাঝি ছিল। আড়াই শ যাত্রীকে তারা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মালয়েশিয়ার উপকূলে নামিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। টানা দশ ঘণ্টা চলল ট্রলার। পড়ন্ত বিকেলে পশ্চিম দিগন্তে গাছগাছালির ক্ষীণ রেখা দেখে যাত্রীদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কেটে যেতে লাগল। ঐ রেখাটাই বুঝি স্বপ্নভূমি মালয়েশিয়া! আনন্দে তারা এতটাই উৎফুল্ল হয়ে উঠল ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা প্রায় ভুলেই গেল। অথচ তখন, সমুদ্র যখন ধীরে ধীরে রঙিন হয়ে উঠছিল, ট্রলার থামিয়ে নোঙর ফেলল মাঝিরা। মাঝসমুদ্রে হঠাৎ নোঙর ফেলার কারণ বুঝতে পারল না কেউ। ভাবল, হয়ত অন্য কোনো ট্রলার এসে নিয়ে যাবে তাদের। মালয়েশিয়ার উপকূলে পৌঁছে গেল কিনা, জানতে চাইল কমল। মাঝিরা জবাব দিল না। উদ্বিগ্ন কমল আবার জিজ্ঞেস করলে এক মাঝি ধমকে উঠল, 'চুপ।'

কমল চুপ করে। খিদায় সে এতটাই ক্লান্ত, মুখে কথা আসছিলও না ঠিক। তাকে দেখে আর চেনাই যায় না। তার বন্ধুবান্ধব কেউ তাকে দেখলে কবর থেকে উঠে আসা কঙ্কাল ভেবে নিশ্চিত দৌড়ে পালাবে। সারা গায়ে বিচি-পাঁচড়া। গায়ের গোরা রংটা রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। চোখের নিচে বুড়োদের মতো পড়েছে অসংখ্য ভাঁজ। লম্বা চুলগুলো আরো লম্বা হয়ে কাঁধ ছুঁয়েছে। মুখে গজিয়েছে লম্বা দাড়ি। বাকিদেরও একই হাল। দুপুরে ভাত রান্না হয়েছে, অথচ কাউকে খেতে দেয়নি। তখন, নোঙর ফেলার পরে, হয়ত নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়, পলিথিনের ঠোঙায় মাঝিরা এক মুঠো ঠান্ডা ভাত আর দুই টুকরো করে শসা খেতে দিল সবাইকে। খেতে গিয়ে যাত্রীদের হেঁচকি ওঠে। ভাত খেতে দিয়েছিল আগের দিন দুপুরে, পেট তো শুকিয়ে কাঠ, হেঁচকি ওঠাটাই স্বাভাবিক। এক ঢোক পানির জন্য তারা আকুতি জানাল। মাঝিরা পানি দিতে কার্পণ্য করল না। জনপ্রতি দুই মগ, কেউ কেউ তিন মগও পেল।

মাঝিদের এই উদারতা দেখে কমলের মনে সন্দেহ উঁকি দেয়। দুপুরে এক মগ পানির জন্য যাত্রীরা কতবার বাপ ডেকেছে, কতবার হাতেপায়ে ধরেছে, তবু তাদের মন এতটুকু গলেনি, অথচ এখন কিনা তারা দাতা হাতেম তাঈ! তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় একটা বিপদের গন্ধ টের পায়। খানিকের মধ্যে সন্দেহটা আবার কেটেও যায়। ভাবে, ট্রলার হয়ত সত্যি সত্যি মালয়েশিয়ার উপকূলে পৌঁছে গেছে। পানি পর্যাপ্ত আছে বলেই হয়ত খেতে দিচ্ছে। শেষ বেলায় মাঝিরা হয়ত যাত্রীদের অভিশাপ নিতে চাচ্ছে না।

আকাশটাকে শূন্য করে দূর পশ্চিমে গাছগাছালির ক্ষীণ রেখাটির আড়ালে পালিয়ে গেল সূর্য। চারদিকে শুরু হলো আলো-অন্ধকারের পাঞ্জা লড়াই। ঠিক তখনই ট্রলারটি দেখা গেল। অস্তাচলের দিক থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। প্রথম দেখতে পায় দীপঙ্কর, তারপর কমল এবং তারপর বাকিরা। কমল ভাবল, থাই বা মালয়েশিয়ান জেলেদের ট্রলার বুঝি। সারা দিনে এমন ট্রলার আরো দেখা গেছে। কেবিনের রেলিং ধরে মাঝিরা দাঁড়িয়ে। তাদের চোখ দেখে মনে হয় এতক্ষণ তারা ট্রলারটির অপেক্ষা করছে।

ধীরে ধীরে আরো কাছে এগিয়ে এলো ট্রলারটি। পাছার সঙ্গে পাছা লাগাল। পাটাতনে একদল অস্ত্রধারী দাঁড়িয়ে। রোদেপোড়া তামাটে মুখ আর চোখগুলো খুনির। ডাকাত ভেবে যাত্রীরা হৈ-হুল্লোড় শুরু করে দিলে এক মাঝি বলল, ডাকাত নয়, খাবার আর ডিজেল নিয়ে এসেছে তারা। খাবারের কথা শুনে আনন্দ কি আর রাখার জায়গা পায় যাত্রীরা! হর্ষধ্বনি দিতে শুরু করল। তবে তা কয়েক মুহূর্ত। সহসা তারা এই ভেবে চিন্তিত হলো, তবে কি মালয়েশিয়া আরো দূরে?

'দূরে হবে কেন? এসেই তো পড়েছি।' অভয় দিল এক যাত্রী।

'তাহলে ডিজেল আর পানি কেন?' প্রশ্ন করল আরেকজন।

প্রথমজন বলল, 'আমাদের নামিয়ে দিয়ে মাঝিদের আবার পেদাং বেসায় ফিরে যেতে হবে না? তেল-পানি ছাড়া যাবে কেমন করে?'

হর্ষধ্বনির ঐ মুহূর্তগুলোই কাজে লাগল তিন মাঝি। যাত্রীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই চট করে তারা ট্রলারটিতে উঠে পড়ল। ভটভট শব্দ তুলে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যেদিক থেকে এলো ট্রলারটি সেদিকে ছুটতে শুরু করল। হতভম্ব যাত্রীরা অবিশ্বাস্য চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। তারা ভেবে পায় না এই অকূল সাগরে এতগুলো মানুষকে ফেলে কোথায় চলে যাচ্ছে মাঝিরা। আশঙ্কার বাস্তব রূপ দেখে কমল হাসে। তাকে ধ্যানমগ্ন ঋষীর মতো দেখায়। যাত্রীদের উদ্দেশে সে বলল, 'তারা আমাদের ফেলে পালাচ্ছে।'

'পালাচ্ছে মানে?'

'আর কখনো ফিরবে না।'

'তুমি কী করে জান ভাই? তারা কি বলেছে তোমাকে?'

'সব কথা বলতে হয় না, কিছু কথা আন্দাজ করে নিতে হয়।'

বিপন্ন যাত্রীরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। নিঃশব্দে। চোখেমুখে জিজ্ঞাসা, লোকটা কি সত্যি বলছে? মাঝিরা সত্যি সত্যি আমাদের ফেলে পালাচ্ছে? উত্তর দিতে পারে না কেউ। অবাক চোখে সবাই আবার কমলের দিকে তাকায়। বিস্ময় কেটে অসহায়ত্ব ফুটে উঠতে থাকে সবার চেহারায়। বিপন্ন কণ্ঠে একজন বলল, 'আমরা এখন কোথায় যাব? কী হবে আমাদের?'

'কী আর হবে, মরণ।'

কথাটি কমল এমন গলায় বলল, তাদের মনে হলো, সত্যি সত্যি যেন পাটাতনের নিচে ওঁৎ পেতে আছে যম। এখনই থাবা মেরে প্রাণটা ছিনিয়ে নেবে। সবার চোখেমুখে মৃত্যুর বিভীষিকা জেগে উঠল। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল। কেউ কেউ দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করল। কান্নাকাটির রোল পড়ে গেল ট্রলারজুড়ে। আতঙ্কে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল কয়েকজন। মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত দীপঙ্কর পাগলের মতো বোবা চিৎকার করতে লাগল। মাঝিরা পালিয়ে গেছে সে জন্য নয়, সে চিৎকার করছে কল্পচোখে ভেসে ওঠা নিজের পচা-গলা লাশ দেখে। সে দেখতে পায়, সমুদ্রের মাছেরা লাশটি খুবলে খাচ্ছে। খেতে খেতে এক বিন্দু মাংসও আর অবশিষ্ট রাখে না। তারপর কঙ্কালটা তলিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের গভীর তলদেশে। সে স্পষ্ট দেখতে পায়। নিজের এহেন পরিণতি দেখে সে থরথর করে কাঁপে। মুমূর্ষু মানুষের মতো চোখ দুটো ঘোলা হওয়া ধরে। কমল তাকে ধমকায়, 'কাপুরুষের মতো মরার আগেই মরে যাচ্ছিস দীপঙ্কর? তুই না দর্শনের ছাত্র? তুই না ডারউইন, ফ্রয়েড আর বার্ট্রান্ড রাসেল পড়েছিস? এত এত পাঠ তোর বৃথা গেল? তুই না বুড়ো সান্তিয়াগোর বীরত্বের কথা বলতি? তার কথা ভুলে গেলি?'

বুড়ো সান্তিয়াগো! নামটা শুনে দীপঙ্করের চেহারায় সেঁটে থাকা আতঙ্কের ছাপ কিছুটা হালকা হওয়া ধরে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের বিখ্যাত উপন্যাস দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি'র প্রধান চরিত্র সান্তিয়াগো। ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ের সান্তিয়াগো আর নাট্যকার সেলিম আল দীনের তিরমন...এই দুই চরিত্র নিয়ে গেল বছর তার পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় সে ছোট্ট একটা প্রবন্ধ লিখেছিল। দেখিয়েছিল দুই চরিত্রের তুলনামূলক বীরত্ব। পাটাতনে বসে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো শিকারি সান্তিয়াগোর স্থলে সে নিজেকে কল্পনা করে। কমল তার পিঠে হাত রেখে বলে, যেভাবে বলেছিল সাউথ বেঙ্গল-৩ জাহাজে, খাবার নিয়ে সংঘর্ষের শেষে, 'আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে প্রকৃতির যদি আপত্তি থাকে, শত চেষ্টা করেও লাভ হবে না। যতক্ষণ বেঁচে আছিস লড়াই কর, যেমন লড়াই করেছিল সান্তিয়াগো। এই পৃথিবী একটা যুদ্ধের মাঠ। প্রকৃতি তার লড়াকু সন্তানদের ভালোবাসে।'

কথাগুলো দীপঙ্করের কাছে স্তোত্রের মতো মনে হয়। যেন গীতার কোনো শ্লোকের বাংলা অনুবাদ। মহামতি কৃষ্ণ যেন উপদেশ দিচ্ছেন অর্জুনকে। বিমর্ষ চোখে সে কমলের মুখের দিকে তাকায়। সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারে মুখটা স্পষ্ট দেখা যায় না। কান্নার ঢেকুর ওঠে তার বুকের ভেতর থেকে। সঙ্গে বেরিয়ে আসে গভীর জিজ্ঞাসা, 'এখন কী হবে আমাদের?'

'যা হওয়ার হবে। চল ইঞ্জিন চালু করা যায় কিনা দেখি।'

বলে আর দাঁড়াল না কমল, সোজা ইঞ্জিনরুমে ঢুকে গেল। পেছনে দীপঙ্করও। দুজনে মিলে ইঞ্জিনটা চালু করতে নানাভাবে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। হাল ছেড়ে দিয়ে যখন বাইরে এসে দাঁড়াল, দুজন রোহিঙ্গা ঢুকে মুহূর্তের মধ্যে চালু করে দিল। আরেকজন ধরল হাল। কমল ও দীপঙ্কর তার দুপাশে বসে হাল ধরার কায়দা-কানুন শিখে নেয়। ট্রলার চলতে থাকে। গন্তব্যহীন। অন্ধকার ধীরে ধীরে আরো ঘন হয়ে আসে। আকাশে

চাঁদ নেই। উঠবে কিনা কে জানে। মৃত্যুর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কে রাখে চাঁদের হিসাব! ক্রমে ঊষার দিকে গড়ায় রাত। কমল আর দীপঙ্কর পালা করে হাল ধরে। যাত্রীরা হাঁটু-মাথা এক করে ঝিমায়, কেউ কেউ নাক ডেকে ঘুমায়, কেউ আবার নিশাচরের মতো চোখ-কান খোলা রেখে শিকারীর মতো মৃত্যুকে পাহারা দেয়। কাছে এলেই খপ করে ধরে ফেলবে। এত সহজে মৃত্যুর হাতে নিজেদের সঁপে দেবে না। কমলের চোখ দুটো ঘুমে ভারী হয়ে আসতে চায়, কিন্তু ঘুমালে হাল ধরবে কে? তার দেখাদেখি দীপঙ্করও যদি ঘুমিয়ে পড়ে! তাই সে গল্প বলা শুরু করে। পূর্ববঙ্গ গীতিকার ভেলুয়া সুন্দরী আর আমির সাধুর গল্প। কথা বলার মতো শক্তি নেই, তবু চালিয়ে যায়। ভেলুয়ার গল্পটা শেষ করে সে গুনগুন করে গায় :

এদিকে হইল কিবা শুন বিবরণ
নছররে কি করিল যত ডাকুগণ।
সেই না ছুলুপ আর ছিল যত মাল
বেচিয়া পাইল ডাকু টাকা টালে টাল॥

তারপর কী হলো নছরের জানিস?
কোন নছর?
ঐ যে পূর্ববঙ্গ গীতিকার নছর মালুম, আমিনা সোন্দরীকে ঘরে রেখে যে সমুদ্রযাত্রা করে আর ফিরল না। সুন্দরী বউকে ভুলে বিয়ে করল বার্মার অঙ্গী শহরের কন্যা এখিনকে। তার সঙ্গে সংসার পেতে কাটিয়ে দিল ছয়টি বছর। তারপর একদিন ব্যবসার কাজে আবার সমুদ্রযাত্রা করল নছর। বাহার দরিয়ায় এলে পর্তুগিজ হার্মাদদের কবলে পড়ল তার ডিঙা। দাড়ি মাল্লা সুকানি টেণ্ডল সবাইকে বন্দি করল হার্মাদরা। নছরকে বিক্রি করে দিল এক গেরস্তের কাছে। গেরস্তের গোলামি করে নছর। বাজার-সদাই করার জন্য তাকে যে নৌকাটা দেওয়া হয়েছিল সেটি নিয়ে গোপনে একদিন সে দেশের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। বেমান সাগরে তার ছোট্ট নৌকা ভেসে চলল টানা চার দিন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তো সে কাহিল। আচমকা তুফান উঠল অকূল দরিয়ায়। নছর তো বেদিশ। আল্লার নামে জিকির করতে করতে সে বেঁহুশ হয়ে পড়ল। কী সুন্দর গীতিকা শোন :

দরেয়ার পীর সেই খোয়াজ খিজির
শুনিল শুনিল যেন তাহার জিকির॥
বড় বড় নুকা লৈয়া খাটাইয়া পাল
সারি গাইয়া যায় রে জাইল্যা বোসাইতে জাল॥
মাঝ দরিয়ায় ছোড নুকা ঢেউয়ের মাথাৎ খেলে
দেখি তারা ধীরে ধীরে নুকা ধরি ফেলে॥
নছররে পাইয়া তারা তুলিয়া আনিল...

গাইতে গাইতে কমলের চোখ ভারী হয়ে আসে। ঘুম আর বাঁধ মানতে চায় না। হাঁটুতে মাথা গুঁজে নাক ডাকছে দীপঙ্কর। কমল তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলে। হালটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে নোনাজলে মুখটা ধুয়ে নেয়। পুব দিগন্তে তাকিয়ে দেখে রক্তিম লালিমা। অন্ধকার হালকা হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। সমুদ্রপাখিদের ওড়াউড়ি শুরু হয় নির্মল আকাশজুড়ে। ভোরের পরিচিত সূর্য দেখে ট্রলারের গতিপথ টের পায় কমল। কপালে হাতের তেলো ঠেকিয়ে উদয়াচলের দিকে তাকায়। আকাশ ও সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই ঠাওরে আসে না। সারা রাত ট্রলার পুব দিকে চলেছে! তার আন্দাজ, পুবে নয়, মালয়েশিয়া দক্ষিণে। দ্রত সে দক্ষিণে হাল ঘুরিয়ে দিল। শিশুসূর্য বাঁয়ে রেখে ট্রলার ছুটতে লাগল দক্ষিণে। ততক্ষণে যাত্রীরাও জেগে ওঠে। খাবারের সন্ধানে তারা কেবিনের কোনাকাঞ্চি তল্লাশি শুরু করে দেয়। ট্যাঙ্কিতে কিছু পানি ছাড়া খাওয়ার মতো আর কিছু পায় না।

ট্রলার যে ডিজেলে চলে তা একবারও কমলের মাথায় আসেনি। সে ভেবেছিল ট্রলারটা এভাবে অনন্তকাল চলতে থাকবে। একবার ডাঙার নাগাল পেলে বেঁচে যাবে, এই ভাবনা তাকে স্বস্তি দিয়েছিল। কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ইঞ্জিনটা যখন বন্ধ হয়ে গেল, সে ভাবল যান্ত্রিক কোনো ত্রুটি বুঝি। তখনো ডিজেলের কথা তার মাথায় এলো না। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে ইঞ্জিন চালুর ব্যর্থ চেষ্টার পর এক রোহিঙ্গা যখন বলল, 'ডিজেল ফুরাই গিইয়্যে পাঁল্লার', সে তখন চমকে উঠল। নিদারুণ বিপন্ন বোধ করতে লাগল। কোমরে হাত ঠেকিয়ে অসহায় দাঁড়িয়ে রইল। এখন কী উপায়? মাস্তুলে পাল তুলে দিলে একটা গতি হয়, কিন্তু পাল তৈরির মতো ট্রলারে কিছু নেই। কেবিনের কাঠ খুলে দাঁড়ের ব্যবস্থা না হয় করল, কিন্তু বাইবে কে? যাত্রীদের শরীরের অর্ধেক তো যমের দখলে চলে গেছে। যমের সঙ্গে লড়বে, না দাঁড়ের সঙ্গে? অগত্যা হাল ছেড়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় থাকল না তার।

ততক্ষণে ভাটা শুরু হয়ে গেছে। ভাটার স্রোতে সওয়ার হয়ে ট্রলার ছুটতে থাকে দক্ষিণে। ধীরে। রোদের তীব্রতায় শরীরের হাড়সুদ্ধ সেদ্ধ হওয়ার জোগাড়। যাত্রীদের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে যে, দক্ষিণে শুধু সাগর আর সাগর। মহাসমুদ্র। ডাঙা বলতে কিছু নেই। ঐ সমুদ্র থেকে কেউ কোনোদিন জ্যান্ত ফিরতে পারে না।

কথাটার ভার বইতে না পেরে কান্নাকাটি শুরু করে দিল সবাই। বাঁচার সর্বশেষ উপায় হিসেবে হাতগুলো করজোড়ে তুলে ধরল, 'মাবুদ, আমরা তোমার গুনাগার বান্দা। এই মুশকিল তুমি আসান করো।'

সমস্বরের কান্নার ভেতর দূর দক্ষিণে জাহাজের মাস্তুলটা কেউ একজন প্রথম দেখতে পেল। আঙুলের ইশারায় সে দেখাল তার পাশেরজনকে। চোখগুলো ক্রমশ স্থির হলো দক্ষিণে, মাস্তুলের দিকে। মুহূর্তে মাস্তুলটা সবার দৃষ্টিসীমায় চলে এলো। আনন্দে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল সবাই। আনন্দ ও বিষাদের অশ্রু মিলেমিশে একাকার হয়। এই ঘটনাকে তারা তাদের স্রষ্টার বিশেষ করুণা হিসেবে দেখে। নইলে প্রার্থনা শেষ হওয়ার আগেই জাহাজটা দেখা যাবে কেন? নিশ্চয়ই বান্দাহর ফরিয়াদ তিনি কবুল করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের উদ্ধার করতেই জাহাজটা পাঠিয়েছেন। শুকরিয়া আদায় করতে কেউ কেউ পাটাতনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল।

ধীরে ধীরে আরো কাছে এগিয়ে এলো জাহাজটি। মাস্তুলে ওড়া পতাকা দেখে কমল আন্দাজ করল জাহাজটি নৌবাহিনীর। কোন দেশের নৌবাহিনী? পতাকাটি কোন দেশের? ঠিক আন্দাজ করতে পারে না। পৃথিবীতে কত দেশ, কত পতাকা, ক'টার কথা মনে থাকে! তবে মালয়েশিয়ার পতাকা যে নয়, মোটামুটি নিশ্চিত। বছর দুই আগে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদের স্মৃতিকথা নিয়ে লেখা 'অ্যা ডক্টর ইন দ্য হাউস' বইটির বাংলা অনুবাদ পড়ে দেশটি সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়েছিল তার। বইয়ের এক পাতায় মালয়েশিয়ার পতাকা হাতে ড. মাহাথিরের একটি ছবিও ছিল। পতাকার রং এখনো মনে আছে। এক কোণে চাঁদ-তারা খচিত, বাকিটা লাল-সাদা রেখাঙ্কিত। কোন দেশের পতাকা তবে? থাইল্যান্ডের? তা তো হওয়ার কথা নয়। থাইল্যান্ড তো উত্তরে। তবে কি ইন্দোনেশিয়ার? কে জানে, হলেও হতে পারে। ভাটার স্রোতে ভাসতে ভাসতে ট্রলারটি হয়ত ইন্দোনেশিয়ার জলসীমায় চলে এসেছে।

যাত্রীরা হাউমাউ করে কাঁদে আর হাত বাড়িয়ে জাহাজের নাবিকদের সাহায্য প্রার্থনা করে। নাবিকেরা নিশ্চুপ। চেহারা দেখে বোঝা মুশকিল তারা বিরক্ত, না রাগান্বিত। কেবিনের ছাদে দাঁড়িয়ে কমল তাদের মতি বোঝার চেষ্টা করে। বুকটা দুরুদুরু কাঁপে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিপদের গন্ধ টের পায়। ভিনদেশের সমুদ্রসীমায় অনুপ্রবেশের দায়ে সবাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে না তো! নিক। এতগুলো মানুষকে মেরে তো ফেলবে না আর! বড়জোর জেলে চালান করবে। করুক। এই দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে ভাসার চেয়ে কারাগার অনেক ভালো। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অন্তত মরতে হবে না। হাঙর-কুমিরের পেটে চলে যাওয়ার ভয় থাকবে না।

ছোট্ট একটা নৌকায় চড়ে চার নাবিক ট্রলারে উঠল। শার্টের সঙ্গে আটকানো পিতলের মনোগ্রাম দেখে কমল বুঝতে পারল তারা ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনী। কাউকে কিছুই জিজ্ঞেস করল না তারা। জীর্ণ ট্রলারে ভাসমান কঙ্কালসার মানুষরা কারা, কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে...সবই যেন তাদের আগে থেকে জানা। অবশ্য জিজ্ঞেস করেও তো লাভ নেই। কে বুঝবে তাদের ভাষা। ইংরেজিতে বললে কমল বা দীপঙ্কর না হয় বুঝত। পরস্পরের সঙ্গে তারা এমন এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে, অনেক চেষ্টা করেও কমল একটি শব্দও ঠিকমতো বুঝতে পারল না।

ছোট্ট নৌকাটি থেকে দুই টিন বিস্কুট আর কিছু মিনারেল ওয়াটারের বোতল ট্রলারে তুলল নাবিকেরা। তারপর তুলল এক টিন ডিজেল। বিস্কুট

আর পানি নিয়ে যাত্রীরা কাড়াকাড়ি শুরু করে দিলে এক নাবিক ছুঁচোর মতো মুখটা কুঁচকে চিৎকার করে যে শব্দটা উচ্চারণ করল তা কমবেশি সবাই বুঝতে পারল। তাদের কাছে 'বাস্টার্ড' খুব বেশি অপরিচিত শব্দ নয়। কিন্তু ক্ষুধার তোড়ে গালিটা তিষ্ঠোবার জায়গা পেল না, কাড়াকাড়ি সমানে চলতেই লাগল। ঠেলাঠেলির কারণে ট্রলারটি এমনভাবে দুলতে লাগল, নাবিকেরাও ভয় পেয়ে গেল। পরিস্থিতি নিজেদের নাগালে আনতে পিস্তল উঁচিয়ে একটা গুলি ছুঁড়ল নাবিক। মুহূর্তে নীরবতা নেমে এলো ট্রলারজুড়ে। হাতের ইশারায় সবাইকে শান্ত হয়ে বসতে বলল নাবিক। কথা অমান্য করল না কেউ, যে যার জায়গায় চুপচাপ বসে পড়ল। নাবিকেরা তখন সবার হাতে হাতে বিস্কুট আর পানি বিতরণ শুরু করে দিল।

কমলের আতঙ্ক কিছুটা কাটে। নাবিকরা তাদের আটক করে নিয়ে যাচ্ছে না, এই ভেবে স্বস্তি বোধ করে। দীপঙ্করসহ ডিজেলের টিনটা ধরে ইঞ্জিনরুমে নিয়ে গেল। শেষ বিন্দুটুকু ঢেলে ইঞ্জিন চালু করে দিল। দীপঙ্করকে হাল ধরিয়ে দিয়ে কেবিনের ছাদে উঠে দাঁড়াল সে। চার নাবিক ততক্ষণে তাদের নৌকায় উঠে গেছে। ট্রলার চলতে শুরু করেছে দেখে যাত্রীরা আনন্দে হৈ-হুল্লোড় শুরু করে দিল। সত্যি সত্যি তবে তাদের উদ্ধার করছে নাবিকরা? আল্লাহ মেহেরবান! নৌকা থেকে তখন এক নাবিক হাতের ইশারায় কমলকে যা বোঝাতে চাইল তার অর্থ এই, দক্ষিণে নয়, ট্রলার উত্তরে ঘোরাও।

উত্তরে কেন? প্রশ্নটা করতে চেয়েছিল কমল। কিন্তু সে এতটাই হতাশ যে, প্রশ্ন করার মতো ভাষা খুঁজে পেল না। নাবিকটির চোখের ভাষা বলে দিচ্ছে ট্রলারের হাল এক্ষুণি উত্তরে না ঘোরালে সে অঘটন ঘটিয়ে বসবে। তারা সমুদ্রপ্রহরী, ঘটাতেই পারে। সেই অধিকার রাষ্ট্র তাদের দিয়ে রেখেছে। তাদের সঙ্গে কত অস্ত্র। দেশের স্বার্থ রক্ষার্থে একটা গুলি খরচ করলে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভেতরে গিয়ে ট্রলারটা উত্তরে ঘুরিয়ে দিল কমল। ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে ট্রলার ছুটতে থাকে উত্তরে। সে চুপচাপ হাল ধরে বসে থাকে। যাত্রীদের মধ্যে অদ্ভুত নীরবতা। চোখেমুখে বিস্ময়। চিৎকার করে কেঁদেকেটে আবারও নাবিকদের সাহায্য চাইবে, না পাটাতনে কপাল ঠুকবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারে না তারা। শুকিয়ে পেট-পিঠ এক হয়ে যাওয়া যে রোহিঙ্গা যুবক মুনাজাত ধরে সবচেয়ে বেশি কান্নাকাটি করেছিল এবং নৌবাহিনীর জাহাজের মাস্তুল দেখে অপার্থিব রোশনাইয়ে যার চেহারাটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, কমলের দৃষ্টি তার দিকে। যুবক মাথা কাৎ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসছে। তীব্র বিদ্রূপমাখা অট্টহাসি।

মাথা সোজা করে যুবক পাটাতনের দিকে তাকাল। চোখ বুজে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। চোখ বুজে আছে কেন লোকটা? সূর্যের উত্তাপ কি তার দৃষ্টি ঝলসে দিয়েছে? সে কি চারদিকে অন্ধকার দেখছে? তখন, অন্ধকারে কিছু ঠাওর করতে পারছিল না বলেই হয়ত, অকস্মাৎ পা ফসকে সে সাগরে পড়ে গেল। সর্বনাশা ঢেউ মুহূর্তে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল বহু দূরে। পাটাতনের নিচে ওঁৎ পেতে থাকা মৃত্যুর ভয়ংকর থাবা দেখে ভয়ার্ত যাত্রীরা চিৎকার করে উঠল। তাদের চোখেমুখে আবারও জেগে উঠল মৃত্যুর বিভীষিকা।

ট্রলার চলতে থাকে। চলাটাই যেন তার নিয়তি। তিন দিন দুই রাত চলার পর যখন সন্ধ্যা ঘনাল উত্তরে দেখা গেল আরেকটি জাহাজ। দেখতে প্রায় আগেরটির মতো। নাবিকদের পোশাকের রংও একই। শুধু পতাকার রং আলাদা। জাহাজটি দেখে আগের মতো কেউ আর উৎফুল্ল হলো না। ভীতও না। পাটাতনে সবাই ঝিম মেরে বসে রইল। দীপঙ্করের হাতে হাল ধরিয়ে কেবিনের ছাদে এসে দাঁড়ায় কমল। নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেয়। জাহাজটি যখন আরো কাছে এলো, বিস্ময়ে সে দেখল, তার দিকে বন্দুক তাক করে আছে এক নাবিক। সে নড়ে না। দুরন্ত সাহস নিয়ে সটান দাঁড়িয়ে থাকে। জাহাজ থেকে ভেসে এলো মাইকের শব্দ। ট্রলারের যাত্রীদের উদ্দেশে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে এক নাবিক। কমলের অনুমান, থাই ভাষা। পেদাং বেসার জঙ্গলে পাজুবানের লোকদের মুখে এমন ভাষা শুনেছে, তার মনে আছে। কিন্তু কী তাদের বক্তব্য, কিছুই বুঝতে পারল না। বন্দুকধারী নাবিকটির হাত নাড়ানোর ধরন দেখে পূর্বঅভিজ্ঞতা থেকে আন্দাজ করতে পারল, সাবধান, উত্তরে নয়। উত্তরে যাওয়া বারণ। গেলে গুলি করে মারা হবে। দ্রুত দক্ষিণে হাল ঘোরাও।

পৃথিবীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ক্লান্ত সূর্য পশ্চিমে ডোবে। চরাচরে সন্ধ্যা নামে। আকাশ আর সমুদ্র গলাগলি করে। ছাতিফাটা তৃষ্ণায় অতিষ্ঠ হয়ে নোনাপানি গিলে বুক ভেজায় যাত্রীরা। নাড়িভুড়ি চিনচিন করে, তবু খায়। নোনা হলেও তো পানি। বুকটা তো অন্তত ভিজবে। এক বাঙালি, পেদাং বেসার জঙ্গলে প্রহরীরা হাতুড়ির আঘাতে যার বাঁ হাতের আঙুলগুলো চূর্ণ করে দিয়েছিল, পাগলের মতো মগ কেটে কেটে নোনাপানি গিলতে লাগল। অন্ধকারে তার এই কাণ্ড কেউ দেখে না। দেখে শুধু সিতারা। সিতারাবানু। সে তো সর্বদ্রষ্টা। কিছুই তার চোখ এড়ায় না। সে দেখল, নোনাপানি গিলতে গিলতে লোকটার পেট যখন ঢোল হয়ে উঠল, হাত-পা ছেড়ে দিয়ে সে পাটাতনে শুয়ে পড়ল। যাত্রীরা তখন শোরগোল শুরু করল। একজন বলল, 'মরল নাকি?' আরেকজন বলল, 'মরুক। বেঁচে থেকে কী লাভ?'

লোকটার হেঁচকি ওঠে। নাকে-মুখে জল ছাড়ে। ডাঙায় তোলা মাছের মতো একেকবার লাফিয়ে ওঠে। কেউ একজন ভয়ে কেঁদে ওঠে। মৃত্যুর উপস্থিতি টের পেয়ে তটস্থ হয়ে পড়ে সবাই। সবার মুখে মুখে সেই প্রাচীন শ্লোক, 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা...।' কিন্তু শ্লোকের পরোয়া করল না পাটাতনের নিচে ওঁৎ পেতে থাকা আজরাইল। মধ্যরাতে লোকটার পিঞ্জরে নেমে এলো তার সর্বনাশা থাবা।

মৃত্যুর নিষ্ঠুর এই থাবা চলতে থাকে টানা চার দিন। কখনো সকালে, কখনো বিকেলে, কখনো মধ্যরাতে। কখনো একজন, কখনো দুজন, কখনো একসঙ্গে তিনজন থাবার শিকার হতে থাকে। জীবিতরা লাশগুলোকে সমুদ্রে ফেলে দেয়। এতটুকু শোক করে না। চোখে এতটুকু অশ্রু আসে না। একটা লাশ ফেলে হাত-পা গুটিয়ে অপেক্ষায় থাকে কখন তার ডাক পড়বে। কখন তার লাশটি তুলে দেওয়া হবে আদিমাতার কোলে।

চতুর্থ দিন কৌতূহলী কমল গুনে দেখল আড়াই শ যাত্রীর মধ্যে আছে মাত্র এক শ সাতাশজন। তার বুক ফেটে কান্না এলো। কল্পচোখে লাবনীর মুখটা ভেসে উঠলে দ্বিগুণ বেগে উথলে ওঠে কান্না। বাবা-মায়ের মুখ মনে পড়ল। বন্ধুদের মুখগুলো মনে পড়ল। শুনতে পায় কোনো এক বন্ধুর ডাক। তার নাম ধরে ডাকছে। তার কণ্ঠ ভেসে আসছে বহুদূর থেকে।

দিগন্তের দিকে বুক টান টান করে দাঁড়িয়ে সে অশ্রু সংবরণ করে। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে সে যখন কেবিনে ঢুকল। দরজার সামনে হাড়ঝিরঝিরে এক রোহিঙ্গা উবু হয়ে বসে আছে। তার সামনে এক রোহিঙ্গা কিশোরের লাশ। কমলকে দেখে লোকটি মুখ লুকায়। কী যেন চিবুচ্ছে। কমলের দৃষ্টি স্থির হয় লাশটার ডান হাতে। বাহুতে মস্ত একটা ক্ষত। ভুবুক্ষু কোনো হিংস্র প্রাণী যেন মাংসটা খুবলে নিয়েছে। লোকটা বসে বসে নরমাংস খাচ্ছে।

ইঞ্জিনরুমে ঢুকে দীপঙ্করের গা ঘেঁষে বসল কমল। দীপঙ্কর মুখটা হাঁ করে ঘুমাচ্ছে। চেহারায় হাসির আভাস। ঘুমানোর আগে কি সে হাসছিল? কেন হাসছিল? জাহাজের মায়াবী চোখের সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল বুঝি? হাসিমাখা শীর্ণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কমলেরও ঘুম পায়। স্বপ্নের স্টিমারে চড়ে সে চলে যায় আরো দূর সমুদ্রে। হঠাৎ লাবনীকে দেখতে পায়। কোনো এক সমুদ্রতীরে লাবনী দাঁড়িয়ে আছে। একা। পরনে লাল-সবুজ শাড়ি। আঁচলটা পত পত করে বাতাসে উড়ছে। অথৈ জলে হাবুডুবু খেতে খেতে সে লাবনী লাবনী বলে চিৎকার করে। লাবনী শুনতে পায় না।

দীপঙ্কর আর জাগেনি। তার মতো কমলের ঘুমও হয়ত আর কোনোদিন ভাঙত না, যদি না মুখে ঠান্ডা জলের ছোঁয়া লাগত। সে চোখ মেলে দেখল তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে একদল অচেনা মানুষ। বেশিরভাগই সমুদ্রের জেলে। কারো মাথায় কালো ক্যাপ, কারো মাথায় ঝাকড়া চুল। কেউ শ্যামলা, কেউ ফর্সা। কেউ তার দিকে তাকিয়ে, কেউ কথা বলছে, কেউ হাসছে। কমল আবার চোখ বন্ধ করে। বেঁচে আছে না মরে গেছে বুঝে ওঠার চেষ্টা করে।

তারপর আবার চোখ মেলে তাকায়। অচেনা লোকগুলো তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। তাদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখেই কিনা কে জানে, তার দু-চোখের কোণ বেয়ে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

সিতারাবানু তখন দূর সমুদ্রে ঢেউয়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে তার শেষ কথাটি বলল, ডুবন্ত নৌকা থেকে নছর মালুমকেও একদিন জেলেরাই উদ্ধার করেছিল। ঠিক এইভাবে। ৯০